দিদিকে—

তমসার শেষে

আলেক্‌সাই টলষ্টয়

প্রথম খণ্ড

—অনুবাদক—

অশোক গুহ

পূরবী পাবলিশার্স
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ সোম
পূর্বাশা পাবলিশার্স
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীকিশোরীমোহন নন্দী
গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা

পরিচিতি

আলেক্‌সাই টলষ্টয় ঋষি-টলষ্টয়ের বংশধর—এই তাঁর কৌলিক পরিচয়। কিন্তু জন্মাধিকারের এই সংকীর্ণ বৃত্তেই তাঁর পরিচয় শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর আর এক বড় পরিচয় আছে। তিনি রহস্যময়ী রাশিয়াকে চেনেন, এবং নিজের দেশের ও পৃথিবীর জনগণের কাছে তাকে চিনিয়ে দেয়ার ভার তিনি নিয়েছেন। গত চল্লিশ বছর ধরে এই পরিচিতির পালা চলেছে। নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, রূপকথা—কিছুই তাঁর কলম থেকে বাদ পড়েনি। এদের ভেতর উপন্যাসেই তাঁর প্রসিদ্ধি বেশি। উপন্যাসের বিরাট ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, বাঁধা-ধরা ঔপন্যাসিক সংস্কারের কাঁটা-তার তাকে ঘিরে রাখতে পারে না। মহনীয় হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টি, সেখানে তিনি সার্থক। 'মহিমময় পিটার' তার নিদর্শন। 'মহিমময় পিটার'-এ তিনি সতেরো শতকের শেষ থেকে আঠারো শতকের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাশিয়ার এক যুগ-সন্ধির ছবি এঁকেছেন। পাশ্চাত্য জগতের সংগে রাশিয়ার পরিচয়ের তখনই সূত্রপাত। তাঁর শেষ উপন্যাস: ট্রিলজি বা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, বিপ্লব আর অন্তর্যুদ্ধ তার উপজীব্য। এই উপন্যাস-ত্রয়ীই এই পরিচিতির বিষয়।

উপন্যাস-ত্রয়ীর আলেক্‌সাই টলষ্টয় নামকরণ করেছেন: Visit to the Damned বা 'অভিশপ্ত ভূমিতে'। ইংরেজীতে যিনি অনুবাদ করেছেন, তিনি মূলানুযায়ী নাম রাখেন নি। 'Darkness and Dawn' বা 'তমসা ও উষা' বলে তিনি উপন্যাস-ত্রয়ীকে অভিহিত করেন। তাঁরই অনুসরণে এই বাংলা অনুবাদের নামকরণ হল 'তমসার শেষে'।

'তমসার শেষে'র প্রথম পর্ব 'দুই বোন' আলেক্‌সাই টলষ্টয় লিখতে শুরু করেন ১৯১৯ সালে। 'দুই বোন'-এর পটভূমিকা ক্ষয়িষ্ণু পিটার্সবুর্গ সমাজ; বিলাসী, বুদ্ধিজীবী পরভৃতের দল সেখানে ভিড় করেছে। তাদের সংগে রাশিয়ার কোনো অন্তরের যোগ নেই, কল্পনায় তারা দেখেছে এক মহাবিপ্লবের ছবি। গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সংগে সংগে তাদের সে কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল, সামন্ত কোটরে বসে আর স্বপ্ন দেখা চললো না। মাৎস্যন্যায় আর মন্বন্তরের তাণ্ডবে তারা এসে দাঁড়ালো জনগণের মধ্যে। জার চলে গেলেন, সাম্রাজ্যবাদের শেষ নিশ্বাস মিলিয়ে গেল বিপ্লবের ঝড়ে। এইখানেই 'দুই বোন' শেষ হয়েছে। আলেক্‌সাই টলষ্টয় তেলেগিণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "কিছুই বদলায়নি। মহান রাশিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু তার একটা গ্রামও যদি বাঁচে, রাশিয়া আবার বেঁচে উঠবে।"

দ্বিতীয় উপন্যাস In the Year 1918 বা "১৯১৮ সাল"। তার উপজীব্য অন্তর্বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ রাশিয়া। মহাযুদ্ধ থেকে রাশিয়া বিদায় নিয়েছে সত্য, কিন্তু তার ভেতরে দাউ

দাউ করে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। বিপ্লব-বিরোধীদলের জেনারেল ডেনিকিন, কর্নিলভ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দিকে দিকে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আলেক্সাই টলষ্টয় এই উপন্যাসখানির শেষেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, রাশিয়া বিপ্লবের রক্ত-ঝড়ে ওলট-পালট হয়ে গেছে, তবু বদলায়নি। তার কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়? হয়ত, সেই মহান রাশিয়া আজ আর নেই।... নেই কি?

তৃতীয় উপন্যাস Gloomy Morn বা 'আঁধার প্রভাত'। বিপ্লব বিরোধীদলের সমূলে উচ্ছেদসাধন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনী ছত্রভংগ। রাজধানী মস্কৌয়ের বুকে দুটি নাম জ্বলছে অপূর্ব আভায—তাঁরা লেনিন ও স্টালিন। কিন্তু এখানে হতাশার অন্ধকার নেই, নেই বিষাদের অনুরণন। প্রভাতের পাতলা অন্ধকারে তাদের মিছিল চলেছে, যারা দুঃসহ আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তারাই আনবে নতুন দিন, তারাই গড়বে নতুন পৃথিবী। লেনিন এই আঁধার দূর করতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন। তমসাবৃত রাশিয়া তড়িতালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—তারই ব্যবস্থা হয়েছে। এইখানেই 'আঁধার প্রভাত' এবং উপন্যাস-ত্রয়ী শেষ হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে, এই উপন্যাস-ত্রয়ী মৃত এবং পুনর্জীবিত রাশিয়ার জীবন্ত ছবি। ইতিহাস তার নায়ক। তার প্রাগগ্রসরতার পথে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অতীত অন্ধ সংস্কার। তাব আশা ভবসা রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পথের ধুলোয়—বিরোধের নিকষে মিছে হয়ে গেছে সব। তারপর এই বিপ্লব, এই বিরোধ উত্তীর্ণ হয়ে এল নতুন জীবন, নতুন প্রভাত। কিন্তু এখনও তার আলো ফোটেনি, ঘন অন্ধকার শুধু পাতলা হয়ে এসেছে। আলো ফুটবে, চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আলোয়। কিন্তু পুরনো মৃণ্ময় প্রদীপ পারবে না সে আলোর আবাহন করতে, নতুন জীবনের সে আলো আসবে তড়িতের গতিবেগে ভর করে। অন্ধকার ঘুচে যাবে, কর্মের গুঞ্জন উঠবে; রাশিয়া তখন হবে শ্রমিকের রাশিয়া, জনগণের রাশিয়া।

১১ই এপ্রিল, ১৯৪১ — অনুবাদক

দুই বোন

তমসার শেষে

এক

"... অতীতকে বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতায় আমরা ফিরিয়ে আনতে চাইনা। মরুক, অতীত মরুক! আমরা তার দিকে পেছন ফিরিয়েছি। তবু পেছনে কার আহ্বান? ওঃ, মিলোর ভেনাস! কী হবে ওকে দিয়ে? খেতে পারবনা, চুল গজাবার ওষুধও ও নয়। বুঝতে পারিনা—ঐ পাথরের কংকালের সার্থকতা কোথায়? হাঁ, হাঁ, জানি, তোমরা বলবেঃ আর্ট—ওই মিলোর ভেনাস হচ্ছে আর্টের চরম উৎকর্ষ, পরম নিদর্শন! কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এখনও কি তোমরা আর্টের মোহে ভুলে থাকবে? সুমুখে তাকাও, বেশীদূরে নয়, পায়ের দিকে। আমেরিকায় তৈরী জুতো পরেছ তোমরা। এই ত আর্ট! ঐ যে মোটারটা, রবারের চাকা, ক'গ্যালন পেট্রলে ঘণ্টায় সত্তর মাইল ও দৌড়বে, পৃথিবী পরিক্রমার ইঙ্গিত ওর চাকায় চাকায়—ওর চেয়ে বড় আর্ট আছে নাকি! ... ঐ যে তিরিশ ফুট লম্বা পোষ্টারটা দেখছ? টপ-হ্যাট পরা ছেলেটি কেমন তোমাদের পানে তাকিয়ে হাসছে! সূর্যের সমস্ত আলো পড়েছে যেন ওর মুখে ছড়িয়ে। পোষাকের বিজ্ঞাপন—না, না, উড়িয়ে দিওনা। ওর পেছনে রয়েছে আজকের যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা—দর্জি! আমরা চাই জীবন, রূঢ় জীবন—আর তার বদলে পুরুষত্বহীনের জন্য তৈরী মিষ্টি ফলের সরবৎ খেয়ে আমরা বেঁচে থাকব? অতীতের ভেনাস আর ম্যাডোনার তার চেয়ে বেশী মূল্য দিতে আমরা রাজি নই..."

হাততালির শব্দে ছোট হলটা বার বার কেঁপে উঠলো। বক্তা পেট্রোভিচ স্যাপজকভ মোটা নাকের উপর প্যাসনেটা ভাল করে এঁটে নিলেন, তারপর একটু হেসে বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

মঞ্চের পাশেই একটা লম্বা টেবিল, তারই পাশে বসেছেন দর্শন সমিতির সান্ধ্য বৈঠকের মুরুব্বীরা। মঞ্চের ওপরের ঝাড় লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে তাদের মুখে। প্রথমেই দেখা যায়, বৈঠকের সভাপতি অ্যানটোনোভস্কিকে। ইনি ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়ের অধ্যাপক; তাঁর পাশে ঐতিহাসিক ভেলিয়ামিনভ আজকের বৈঠকের প্রধান বক্তা; তাঁর পাশে আছেন দার্শনিক বরস্কাই এবং লেখক সাকুনিন।

এ বছর সান্ধ্যবৈঠকের অধিবেশনগুলি বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। প্রতি অধি-বেশনেই নতুন নতুন বক্তার সাক্ষাৎ মিলছে, বিখ্যাত সাহিত্যিক আর দার্শনিকদের ওপর চলছে তাদের তীব্র আক্রমণ। আর তাই শুনতে ভিড় করছে, কলেজ আর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা। তাদের হাততালি আর হাসির রোলে ফনটাংকার এই ছোট বাড়ীটা মুখর হয়ে উঠেছে।

আজ সন্ধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্যাপজকভ মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হতেই আকুনদিনের সেখানে আবির্ভাব হল। ছোট্ট মানুষটি, চোয়ালের হাড় জাগানো, লম্বাটে মুখ, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু তারুণ্যের দীপ্তি এখনও মিলিয়ে যায়নি। সান্ধ্যবৈঠকে তার আবির্ভাব বেশি দিন হয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে ছাত্রদের হৃদয় সে জয় করে নিয়েছে। তার পরিচয় কেউ জানে না। তার পরিচিতদের জিজ্ঞাসা করল, তারা উত্তর দেয় না, রহস্যের হাসি হাসে। তার সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে, তার নাম আকুনদিন নয়, বিদেশ থেকে সে এসেছে, এবং এই বৈঠকে অনাহূত তার আগমন।

আকুনদিন তার ছুঁচোলো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে নিস্তব্ধ প্রায় সভার দিকে তাকালো, তার পর মৃদু হেসে বলতে শুরু করলো।

তৃতীয় সারে একটি কালো পোষাক-পরা মেয়ে সান্ধ্য-বৈঠকের মুরুব্বীদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি জ্বলন্ত মোমবাতি-গুলোর ওপর এসে পড়ছিলো।

হঠাৎ তার কাণে এলো আকুনদিন চীৎকার করে বলছে, "জগতের অর্থনীতির প্রথম লৌহমুষ্টি পড়বে এসে গীর্জার গম্বুজের উপর।" মেয়েটির একাগ্রতা ছিন্ন হয়ে গেল। একটা ছোট দীর্ঘ নিশ্বাস উঠলো তার বুক ঠেলে, চার দিকে তাকিয়ে একটা ক্যারামেল মুখে পুরলো।

আকুনদিনের বক্তৃতা চলছে:

"...তবু এখনও তোমরা সেই স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নে বিভোর! আসবে, সে মাটিতে নেমে আসবে! এখনও স্বপ্নের ঘোরে বিড বিড় করে সেই পরম পুরুষ মেসায়ার কথা বলছ? কিন্তু বৃথা—বৃথা! মেসায়া এখনও ঘুমে। জাগবে, সে জাগবে। কিন্তু ক্লীব কবির গানে নয়, সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ায় তার আবাহন হবে না। তার অভ্যর্থনা করবে কারখানার ভেঁপু, তাকে জাগাবে চক্রের ঘর্ঘর, ভয়ে শিউরে উঠবে তোমরা। না, না তোমরা ঘুমোও, তোমাদের জাগাতে চাই না, জাগাতে পারবো না! কিন্তু মুক্তিদাতা মেসায়ার কথা তোমাদের মুখে যেন উচ্চারিত না হয়। যদি বলি মেসায়া এসেছে, শতাব্দীর গাঢ় ঘুমে তোমরা তাকে চিনতে পারনি! বিশ্বাস করলে না? মেসায়া জন্ম নিয়েছে রাশিয়ার কুটিরে কুটিরে। কিন্তু তাকে নিয়ে তোমরা কি করেছ? কাব্যে বিলাস করেছ, নৃত্যশালায় ভাঁড়ের আঙরাখা পরিয়ে দিয়েছ তার গায়ে! তার ফল তোমরা পাবে, আসবে বিপ্লব, রক্তময় বিপ্লব...

সভাপতি এইখানেই বক্তাকে থামিয়ে দিলেন। আকুনদিন মৃদু হেসে, পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলো। অসংখ্য কণ্ঠ চীৎকার করে উঠলো :

"বলতে দাও, আমরা শুনতে চাই!"

""এ অন্যায় আমরা সইব না।"

"এই গোলমাল কোরোনা।"

"করব আমরা গোলমাল, সভা ভেঙ্গে দেব।"

"আমরা শুনতে চাই, শুনতে চাই!"

আকুনদিন বললো :

'এই মেসায়া কে তোমরা জান? রুশ কৃষক। তারই ভিতর লুকিয়ে রয়েছে বীজ, বিপ্লবের বীজ। কিন্তু সে বীজ তো পড়বে না পলিমাটিতে, ফসলও ফলবে না! কেন পড়বে না জান? তোমাদের কল্পনার স্তর থেকে রুশ কৃষক কখনও নেমে আসবে না নগ্ন বাস্তবে, যেখানে আছে বুভুক্ষা, যেখানে আছে অমানুষিক শ্রম, নির্যাতন আর নিপীড়ণ! তারপর নিজেই একদিন জাগবে, তার নিনাদে কেঁপে উঠবে পৃথিবী, তার পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাবে তোমাদের লালন-ললিত ভাবধারা। সাবধান, তার আগে সাবধান!—

কালো পোষাক-পরা মেয়েটি বক্তৃতা শুনছিল না। তার মনে হচ্ছিল, এই বক্তৃতার অলংকারের সমারোহের পেছনে যেন লুকিয়ে রইল সবার সেরা কথা, সবার সার কথা।

ঠিক এমনি সময় সভাপতির পাশে এসে বসলো একটি লোক, তার পরণে কালো কোট, মুখ শুকনো, বিবর্ণ, ধূসর চোখ দুটি ঘন ভ্রূর ভেতর দিয়ে দেখা যায়। চারদিক থেকে জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠলো : বেসানভ, কবি বেসানভ!

মেয়েটি বেসানভের মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। ঠিক তেমনি, গত সপ্তাহের সাপ্তাহিকটায় বেসানভের যে ছবিটি দিয়েছিল, ঠিক তেমনি! মুখখানা, কুশ্রী, অথচ কেমন একটা মাধুর্য, একটা নেশা জড়িয়ে আছে যেন!' সে তাকিয়ে রইল, ভয়ে, বিস্ময়ে! পিটার্সবুর্গের কত ঝোড়ো রাতে ভয়ংকর স্বপ্নে এই মুখই ত সে দেখেছে!

প্রধান বক্তা ভেলিয়ামিনভ এবার আকুনদিনের উক্তির প্রতিবাদ করতে মঞ্চে উঠলেন। তিনি বল্লেন :—

"বক্তা সত্যি কথাই বলেছেন। হাঁ, আমরা সেই ভীষণ সংকটময় মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় আছি। বক্তা যে সত্য আমাদের জানালেন, অনেক পূর্বেই আমরা তা জানতে পেরেছি। বক্তা সেই ভয়ংকর দিনে কোথায় যাবেন জানিনা। কিন্তু

আমরা পাবনকে গড়িয়ে পড়তে দেব, বাঁধ দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব না। তারপর তার শক্তি শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ আর একটা কথা—বক্তা ভেঁপু বাজিয়ে যে-স্বর্গরাজ্যের আবাহন করেছেন, সেকি সত্যিই স্বর্গরাজ্য? সেখানে মানুষ হবে যন্ত্র বিশেষ, তার সংজ্ঞা নিরূপিত হবে সংখ্যা দিয়ে—সত্যই কি সে স্বর্গরাজ্য? সেখানে কি আত্মা একদিন বিদ্রোহ করবে না, একদিন কী সে চাইবে না তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা?"

আকুনদিন প্রতিবাদ করলো।—"আমি অমন কথা বলিনি। মানুষকে সংখ্যায় রূপান্তর! এ তো স্রেফ কল্পনা! আমরা জড়বাদী, আমরা কল্পনায় বিশ্বাস করি না।"

ভেলিয়ামিনভ বলতে লাগলো: "পাপপূর্ণ পৃথিবী, আসছে তার শেষ বিচারের দিন ঘনিয়ে।" তার মুখের উপর ঘনিয়ে এসেছে শান্ত গাম্ভীর্য, ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চক্ চক্ করছে তার মুখ। হলঘরের পেছন থেকে অনেক খুক খুক্ কাশি আর গলা খেকারি ডুবিয়ে দিল তার স্বর।

এবার বিরাম। মেয়েটি বুফেতে এসে দাঁড়ালো। অনেকে চা খাচ্ছে, হাসিগল্পে মসগুল সারাঘর। বিখ্যাত সাহিত্যিক কার্ণোবিলিন একধারে বসে ভাজামাছ চিবুচ্ছেন, ওদিকে সাহিত্যরসিকা দুটি প্রৌঢ়া স্যাণ্ডউইচের প্লেটের সামনে গল্পে বিভোর। দু একজন ধর্মযাজককেও দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে, তারা যেন অশুচি বাঁচিয়ে চলছেন। সমালোচক চূড়ামণি চিরভা একধারে কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন। ভেলিয়ামিনভ ঘরে ঢুকলেন, প্রৌঢ়াদের একজন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘরের এক কোণে চলে গেল। আর একজন তখনও স্যাণ্ডউইচ চিবুচ্ছে। এমন সময় বেসানভ ঢুকে তাকে নমস্কার জানালো। কর্সেটের অন্তরালে থলথলে পিণ্ডে একটা কঠিন ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। বেসানভ ঘুমন্ত হাসি হেসে কি বললো, প্রৌঢ়া হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো, চোখ দুটোয় তার মাদকতা।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তার চামড়ার নীচে একটা জ্বালা আস্তে আস্তে সর্বাংগে ছড়িয়ে পড়ছে, মেয়েটি কাঁধ দুটোয় ঝাঁকুনি দিল। জ্বালায় হয়ত এখনও পুড়ছে দেহ, তবু ভংগীতে এসেছে দৃঢ়তা। দ্রুতপায়ে বুফের বাইরে এসে দাঁড়াল। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ভিড়ের ভেতর থেকে একটি যুবক এসে তার হাত ধরলো। গায়ে তার ভেলভেটের জ্যাকেট, মুখে উপবাস ক্লিষ্টতা। ইস্ কি ভিজে ওর হাত, চোখে কি করুণ কোমলতা!—মেয়েটি ভাবলো। নাম, ওর নাম? আলেকজান্দার আইভানোভিচ জিরোভ।

জিরোভ বল্লে, ডারিয়া, দিমিট্রিভনা, আপনি এখানে?

"আপনারই মত বক্তৃতা শুনতে,"—আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জিরোভের অলক্ষ্যে রুমালে দিয়ে মুছলো।

জিরোভ হেসে বল্লে, "স্যাপজকভ বুঝি চটিয়ে দিয়েছে? কিন্তু কেমন বলেছে বলুন—একেবারে খাঁটি ভবিষ্যৎ বক্তা! ওর আক্রোশ আর বলবার ধরণের আপনি নিন্দে করতে পারেন, কিন্তু ওর কথাগুলো—আমাদের গোপন মনের কথা, যা বলবার আমাদের সাহস নেই, ওর আছে।

"আপনার কি মনে হয় না, নতুনের হাওয়া আসছে! তার নতুনত্ব, তার দুঃসাহসিকতা আমাদের মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে! আকুনদিনের বক্তৃতায় সেই সুর। আর দু-একটা শীত—তারপর সব কিছু ভেংগে, গুঁড়িয়ে যাবে।"

নিচু গলায় ও কথা বলছিল। ডাশার মনে হল, ওর ছিপছিপে শরীরটা কাঁপছে এক ভয়ংকর উত্তেজনায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর উচ্ছ্বাস শুনে কী হবে? ডাশা ওর বক্তৃতার মাঝখানে বিদায় নিয়ে ক্লোক-রুমে ঢুকে পড়লো।

ক্লোক-রুমের লোকটা একগাদা ফারকোট নিয়ে ব্যস্ত। কত কাজ তার? ডারিয়া টিকিট দেখালো, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করলো না। ডাশা অনেকক্ষণ বসে রইলো, দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের হিম হাওয়া ঘরের ভেতরে আসছিল, আর গাড়োয়ানদের কলরব।

"কর্ত্তা, আমার গাড়ী, আমার গাড়ী, ঘোড়া আমার উড়ে যাবে।"

হঠাৎ কার স্বর শুনে ডাশা চমকে উঠলো। বেসানভ, বেসানভ? ঠিক ওর পেছনে বেসানভের কণ্ঠস্বর!

"আমার কোট, টুপি আর ছড়ি।"

হাজার ছুঁচ যেন মেরুদণ্ডের ভেতরে ফুটছে। ডাশা মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই বেসানভকে দেখতে পেল। শান্তদৃষ্টি তার, হঠাৎ ধূসর চোখে জ্বলে উঠলো পরিচয়ের আলো। ডাশা কাঁপছে।

"যদি ভুল না করে থাকি ত," বেসানভ একটু ঝুঁকে পড়ে বল্লে, "আপনাকে আমি চিনি, আপনার—"

ডাশা বাধা দিয়ে বললে, "হাঁ আমার দিদির ওখানেই আপনাকে দেখেছি।"

পরিচারকের কাছ থেকে ফারকোটটি একরকম ছিনিয়ে নিয়ে ডাশা বেরিয়ে গেল। বাইরের ঠাণ্ডা, ভিজে বাতাসে ওর পোষাক ভিজে গেল, কোটের কলার দুটি চোখ পর্যন্ত তুলে দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চললো। রাস্তায় একটা লোক হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস্ করে বল্ল:

"কি দুটি চোখ!"

পিচের রাস্তা ভিজে গেছে, অন্ধকারের বুকে কাঁপছে ইলেকট্রিক আলোর শিখা। বেহালার সুর ভেসে আসছে কোনো রেঁস্তরা থেকে। ওয়াল্‌ৎস্? ডাশা কাণ পেতে শুনলো, গানের কলিটা গাইতে গাইতে আবার পথ চলতে সুরু করলো।

দুই

হল ঘরে ঢুকে ডাশা ভিজে কোট ছেড়ে ফেলে পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করলো: কেউ বাড়ি নেই নিশ্চয়ই?

পরিচারিকা লুসা অস্ফুট স্বরে তাকে জানালো, কর্ত্রী বাড়ী নেই, কর্তা স্টাডিতে আছেন।

ডাশা ড্রয়িংরুমে গিয়ে পিয়ানোর কাছে বসলো।

ভগ্নীপতি নিকোলাই আইভানোভিচ বাড়ীতে, তার মানে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। এখুনি ওর কাছে অফুরন্ত অভিযোগ নিয়ে হাজির হবে। এখন কটা? এগারোটা—তিন ঘণ্টা—এখনও তিন ঘণ্টা তার কিছু করবার নেই। পড়তে পারে অবশ্য—কিন্তু কী পড়বে? না, না, তার চেয়ে বসে বসে সে ভাববে। জীবনটা বড়ই নিঃসংগ, বড়ই বিরক্তিকর!

ডাশা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পিয়ানোয় আনমনে একটা গৎ বাজাতে লাগলো। উনিশ বছরের একটি মেয়ের জীবন এমনিই বুঝি দুবিসহ, এমনিই বুঝি বিরক্তিকর—যদি সে বোকা না হয়।

গত বছর সামারা থেকে পিটার্সবুর্গে সে এসেছে আইন পড়তে। উঠেছে তার বোন একাটেরিণা ডিমিট্রিভনা স্মোকভনিকভের বাড়ীতে। ভগ্নীপতি বেশ বড়-দরের ব্যারিষ্টার।

ডাশা বোনের থেকে পাঁচবছরের ছোট। কাটিয়ার বিয়ের সময় ডাশা ছিল ছোট, দেখা সাক্ষাৎও তাদের বেশি হয় নি। কাটিয়াকে এবার ডাশা দেখলো নতুন চোখে—প্রেমিকার চোখে। ডাশা অবাক হয়ে গেল কাটিয়ার চাল-চলনে, তার সৌন্দর্য তাকে করলো অভিভূত। কাটিয়া এগিয়ে চলার দলে, তার গৃহ সজ্জায় আধুনিক রুচির পরিচয়। চিত্রপ্রদর্শনীতে কিম্ভূত ভবিষ্যৎ স্কুলের ছবির সে একজন মুরুব্বী। এই সব ছবি কেনা নিয়ে তার স্বামীর সংগে তার বহু বিবাদ ডাশা দেখেছে। কিন্তু কাটিয়া তবু দমেনি, স্বামীর সংগে বিবাদ সেও স্বীকার, তবু পুরোণোর দলে পড়ে থাকতে সে রাজি নয়। তার শোয়ার ঘরে, ড্রয়িংরুমে রাশি রাশি সব অদ্ভুত ছবি! ডাশা ঐ ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে কত অলস প্রহর কাটিয়েছে আর ভেবেছে ওই জ্যামিতিক, চতুষ্কোন শরীরগুলি তার বুদ্ধির অগম্য, ওদের বোঁযাটে রং তার মাথা ধরিয়ে দেয়। না, না, তারজন্যে সৃষ্টি হয়নি এই মোহ-বিচ্যুত, ঈশ্বর বিদ্বেষী পথের কবিতা।

সমাজ, উচ্চ সমাজের ঘূর্ণাবর্তের সংগেও এইখানেই তার পরিচয়। প্রতি মংগলবার সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণ। তার্কিক ব্যারিষ্টার, প্রেমিক, সমালোচক,

সাংবাদিকের ভিড়। স্নায়ু বিকল চিরভা শুনিয়ে যায় কার ওপরে পড়বে তার সমালোচনার শেল। কবিরাও আসে, ছোকরা কবির দল, পকেটে কবিতার পাণ্ডু-লিপি। আর আসে কাটিয়ার প্রেমিক, না স্তাবকের দল! ভোজের পরে যখন নিদ্রালু হয়ে এসেছে চোখ, তখনই তাদের সময়। কাটিয়ার চেয়ারের পেছনে অস্ফুট গুঞ্জন তোলে। ডাশা এদের আমোলই দেয় না। তার চোখ প্রতিনিয়ত ঘোরে কাটিয়ার চারদিকে। কাটিয়াকে যারা উপযুক্ত সম্মান না করে, তাদের প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা, আবার কারো অতিরিক্ত অন্তরংগতায়ও তার মন ঈর্ষায় সবুজ হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে এই উত্তাল মুখের সমুদ্রের ভেতর থেকে সে মানুষের প্রকৃত পরিচয় জেনেছে। ছোকরা ব্যারিষ্টারগুলোর শুধু বোল চাল—ভেতরে অন্তঃসার শূন্য! পোষাকী প্রেমিকদের মাপা জোঁকা কথা তার মুখস্থ। এক প্রেমিক ডাশার দিকে তাকিয়ে ভড্কার গ্লাস তুলে বলেছিল, "পুষ্পিত বাদাম গাছের উদ্দেশে আমার এই গ্লাস!"

ডাশা টুক টুকে লাল হয়ে উঠেছিল রাগে। আয়নায় ছায়া পড়তেই দেখলো ওর গাল এত লাল যেন সত্যিই ফুটেছে এক থোলো বাদামের ফুল।

গ্রীষ্মে ডাশা ফেরেনি সামারায়। সে গিয়েছিল কাটিয়ার সংগে সমুদ্রের ধারে সেস্টরেটস্কে। নৌ-বিহার, সমুদ্র স্নান, পাইনের ছায়ায় বরফ খাওয়া, রাত্রে দূরাগত সংগীত শোনা আর তারা ভরা আকাশের নীচে পানাহার—কি চমৎকার সে স্মৃতি!

কাটিয়া ওকে উপহার দিয়েছিল এক চমৎকার পোষাক, শাদা এমব্রয়ডারী করা পোষাক। কালো ফিতে দেয়া শাদা টুপি, পিঠে বাঁধবার কালো ওড়না।

অমনি পোষাকে সমুদ্রের ধারে দেখলেই প্রেম? আর প্রেমেও পড়লো ওর ভগ্নীপতির কর্মচারী নিকানর ইউরেভিচ কুলিচক!

ডাশা রেগে গেল। কি, একটা চাকর করবে তার সংগে প্রেম! সে একদিন তাকে পাইনবনের ছায়ায় ডেকে দস্তরমত শাসিয়ে দিল। কুলিচক দোমড়ানো রুমালখানা দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো, কোনো কথা বলতে পারলো না।

রাতে ডাশা জানালো তার ভগ্নীপতিকে কুলিচকের প্রেম কাহিনী। নিকোলাই আইভানোভিচ ধৈর্য্যধরে শুনলেন, তারপর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন সমুদ্রের বালির উপর।

অবশেষে রুমাল বার করে চোখ মুছতে মুছতে বল্লেন, "ডাশা. ডাশা. পালাও এখান থেকে। দোহাই তোমার, হাসতে হাসতে মারা যাব।"

ডাশা বুঝতে পারলো না, হাসির কারণ কি। কুলিচক আর তার দিকে তাকায় নি। কিন্তু ডাশা দেখেছে, কেমন আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছিল কুলিচক! যাক্ চুকে ত গেল! না, ব্যাপারটা চোকে নি! সেই নিস্তরংগ, নিরুপদ্রব জীবন আর নেই। দেহে যেন তার নতুন একটা শরীর আস্তে আস্তে রূপ পরিগ্রহ করেছে, নিরবয়ব এক শরীর! চামড়ার নীচে নীচে তার ব্যাকুলতা; মনের ওপর চেপে বসেছে পাথরের মত। মুক্তি নেই, এই অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে মুক্তি নেই। ওরই হাত এড়াবার জন্য টেনিস খেলছে, ভোরে উঠছে, দু-বার স্নান করছে। এইবার শত্রুর হাত থেকে বুঝি নিষ্কৃতি পেল! 'রাতে নিঃসংগ শয্যায়, বা নির্জন রৌদ্রাক্ত কোনে দুপুরে অদৃশ্য শত্রু আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বুকের ভেতরে নরম থাবা দিয়ে দলছে, দলছে আর পিষছে···

পরিচিতরা সবাই বলছে, কী সুন্দর হয়ে উঠেছে ডাসা! কাটিয়াও একদিন সোজা বলে বসলো,

"এত যে সুন্দর হচ্ছ, কি করবে?"

"তার মানে?" ডাশা অবাক' হলো।

"এবার একটি প্রেমিক চাই—কাটিয়া হেসে উঠলো।

ডাশা অগ্নিদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেনিস লনে ইংরেজ যুবকটির সঙ্গে দেখা। দাড়ি গোঁপ কামানো, ছিপছিপে যুবক। খেলার ফাঁকে একবারও সে ডাশার দিকে তাকায় নি। ডাশা প্রথমবার হেরে আবার তার সঙ্গে খেললো। কিন্তু একবারও তার প্রসংশমান দৃষ্টি ডাশার সমস্ত দেহে শিহরণ এনে দিল না। সে-রাতে ডাশা বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো।

সেদিন থেকে ডাশা আর টেনিস লনে গেলনা। একদিন কাটিয়া বল্লে, "মিঃ বিল যে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।" ডাশা বলে বসলো খেলতে তার ভাল লাগে না। একদিন সে রুটি পকেটে বনে বেরিয়ে পড়লো। পাইন বনের ছায়ায় সারাদিন ঘুরলো, ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিল মাটিতে। ক্লান্তি তার কাছে নিয়ে এল সত্য; সে ভালোবাসে, মিঃ বিলকে সে ভালোবাসে!

তার শরীরী ভ্রূণ এবার পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে।

একপক্ষ ধরে চললো তার এই উন্মাদনা। বিল চলে গেল। ডাশার আর একটি বিনিদ্র রাত কাটলো। নিজের প্রতি ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠলো।

ক্রমে থিতিয়ে এল তার উন্মাদনা। সেই শরীরী জীব এবার তার দেহে মিশে গেছে। দেহে এসেছে তার কোমলতা; আরসীতে মুখ দেখে সে চমকে ওঠে। কোথায় সে বন্য, চপল ভঙ্গী? সেখানে সংযমের ছায়া—চোখ দুটির ভাব মেদুর।

আগস্টের মাঝামাঝি ডাশা পিটার্সবুর্গে ফিরে এল। আবার সেই পুরাতনের পুনরাবর্তন। চিত্রপ্রদর্শনী, সান্ধ্য-ভোজ, থিয়েটারের প্রথম রাত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুৎসা-কাহিনী, পোষাকী প্রেমিকের প্রেম।

হাঁ আর একটা খবর—নতুনের সম্ভাবনা,—নতুন সমাজ, নতুন মানুষ।

একদিন রাতে বেসনভ এসে হাজির। কাটিয়া ওর দিকে তাকিয়ে আরক্ত হয়ে উঠলো। বেসনভের পাশেই ছিলেন দুজন ব্যারিষ্টার, কিন্তু সে তাদের দিকে দৃকপাত না করে কাটিয়াকে বললো:

"কবিতা বলে কিছু নেই আর। সব মরেছে, কবিতা আর মানুষ।"

ব্যারিষ্টার দুজন সাহিত্য-রসিক। তারা তর্কের সূত্র পেয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে বসলেন। কিন্তু বেসনভ তাদের কথায় কাণ দিল না। কাটিয়ার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো নীরবে। ডাশা শুনতে পেল, সে বলছে, "আমি লোকের ভিড় সইতে পারি না।"

"চলি," বিদায়ের সময় অনেকক্ষণ সে ডাশার হাত ধরে রইলো। মজ্জায় মজ্জায় যেন একটা জ্বালা, কিন্তু কি মধুর।

অতিথিরা এবার বেসনভকে নিয়ে পড়লো। তার উপর বর্ষিত হল অনেক কটূক্তি।

পরদিন, ডিনারের পর ডাশা নিকোলাইকে বল্লো, "এর মধ্যে প্রকৃত লোক দেখলাম এক বেসনভকে। তার পাপ, তার অভিজ্ঞতা, তার পছন্দ-সবই মৌলিক। আর সবাইত ধার করা জীবন নিয়ে বেঁচে আছে।"

নিকোলাই রেগে উঠলো। কাটিয়া কোনো কথা বল্ল না।

বেসনভকে নিকোলাইদের বাড়ীতে আর দেখা যায় নি। গুজব, সে নাকি প্রৌঢ়া অভিনেত্রী চারোডিয়েভার সঙ্গে কোথায় চলে গেছে। বহুদিন পরে একদা ডাশা চিত্রপ্রদর্শনীতে বেসনভের দেখা পেল। একটা জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে আপন মনে ক্যাটালগ দেখছে, ওপাশে দুটি কলেজের মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ডাশা তার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। পাশের ঘরে গিয়ে সে ভেঙ্গে পড়লো একটা চেয়ারে। ক্লান্তি, ক্লান্তি—দেহের, মনের।

ডাশা এবার বেসনভের একখানা ছবি কিনে রাখলো টেবিলে, কবিতার তিনখানি সরু সরু বই—প্রথমে পড়ে মনে হল বিষ মাখানো। সে পাগল হয়ে গেল, তার মনে হত, কি এক গোপন রহস্যময় অনুষ্ঠানে সেও যেন বেসনভের সঙ্গিনী। আবার পড়লো সে কবিতাবলী। এবার সে বুঝতে পারলো কবি-হৃদয়ের বিষাদ, তার না-পাওয়ার ব্যাকুলতা! বেসনভের জন্যই সে দর্শন সমিতির সান্ধ্য বৈঠকে যেতে শুরু করলো।

বেসনভের জন্যেই আজ সে একা একা পিয়ানো বাজাচ্ছে। ডাশা মুখ তুললো পিয়ানো থেকে। নরম কমলা রঙের আলোয় ঘর ভরে গেছে—দেয়ালের জ্যামিতিক

মুখগুলো সজীব হয়ে উঠেছে যেন! আদিম অন্ধকার থেকে ভূতের দল উঠে এসেছে, স্বর্গোদ্যানের বেড়া টপকাতে চায়।

ডাশা পিয়ানো বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালো। একটা টান, একটু কাসি, সিগারেটটা দুমড়ে নিভিয়ে দিল। চীৎকার করে ডাকলোঃ নিকোলাই, কটা বেজেছে?

স্টাডিতে কি একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ, উত্তর নেই। পরিচারিকা এসে জানালো, খাবার তৈরী।

খাবার ঘরে নিকোলাইকে দেখতে পেল ডাশা। নতুন নীল পোষাক-পরা, চুল এলোমেলো, দাড়িতে ডিভানের একটা পালক লেগে রয়েছে। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। ডাশা ফুলদানির শুক্‌নো ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে জড়ো করছিল টেবিল ঢাকার উপর; হঠাৎ নিকোলাই ঝুঁকে পড়লো ডাশার দিকে, তার পর বিড় বিড় করে বল্ল, "অবিশ্বাসিনী, কাটিয়া অবিশ্বাসিনী!

তিন

তার নিজের বোন কাটিয়া অবিশ্বাসিনী! কাল রাতে কোন এক অপরিচিত শয্যায়, অপরিচিতের আলিঙ্গনে দেহ সমর্পণ করেছে! ডাশা কল্পনা করে শিউরে উঠলো। এরই নাম বিশ্বাসঘাতকতা! কাটিয়া এখনও ফেরেনি, কিন্তু তার জন্যে নেই তার উদ্বেগ, আশংকা। সে যেন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ডাশার রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীয়মান। নিকোলাই এখনও ফুপিয়ে কেঁদে উঠছে না কেন, এখনও তিক্ত অভিশাপে ফুঁসে উঠছে না কেন নিকোলাই? আশ্চর্য একটি কথাও আর বললো না। চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল। হয়ত, আত্মহত্যা করতে চলে গেল! উৎকর্ণ হয়ে প্রত্যেকটা শব্দ সে শুনলো। কোথায়, কোথায় পিস্তলের নির্ঘোষ? পরিচারিকা ঘরে এসেছে। ডাশা চোখের জল মুছে ড্রয়িংরুমে তাড়াতাড়ি চলে এল।

ড্রয়িংরুম! এর প্রতিটি জিনিষে কাটিয়ার হাতের স্পর্শ। কিন্তু আজ কাটিয়া নেই, তাই যেন কেমন অদ্ভুত লাগছে সব। ডাশা ডিভানে বসে পড়লো। নতুন কেনা ছবিটা রয়েছে। নগ্নমূর্তি এক মেয়ে, চামড়ার রং দগ্‌দগে লাল, যেন ছাল-ছাড়ানো; নাক নেই, নাকের পরিবর্তে ত্রিকোণ একটি খোপ, মাথাটা চতুষ্কোণ। হাতে ফুল। তুপা ছড়িয়ে দিয়েছে—এই ছবিটির নাম 'ভালোবাসা', ভালোবাসা! কাটিয়া নামকরণ করেছিল 'আজকের ভেনাস'। তাই কাটিয়া এই ছবিখানি এত ভালোবাসত! সেও ত এখন একই দলের। ডাশা কুশনের ভিতর মুখ গুঁজে কাঁদলো। নিকোলাই কখন এসে ঢুকেছে ড্রয়িং-রুমে। পিয়ানোয় হালকা সুর

বাজছে! ডাশা হতবাক্ বিস্ময়ে। নিকোলাই পিয়ানোটা সশব্দে বন্ধ করে চিৎকার করে উঠলো: "যা ভেবেছিলাম তাই!"

ডাশা মনে মনে অনেকবার ঐ কথাটা উচ্চারণ করলো, মানে বোঝবার চেষ্টা করলো। হঠাৎ ঘণ্টার শব্দে তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো, নিকোলাই আইভানোভিচের মুখে একটা অস্ফুট শব্দ। ডাশা ডিভান থেকে উঠে ছুটে গেল হলে।

কাটিয়া! আংগুল ঠাণ্ডায় সিটিয়ে গেছে, মুখে অপরিসীম ক্লান্তি। ডাশাকে দেখে এগিয়ে এল। ডাশা নড়লো না, মুখে তার কথা নেই।

"কি হয়েছে তোমার? ঝগড়া করেছ নাকি"—কাটিয়া স্বাভাবক মৃদুস্বরে বললো।

"কিছুই হয়নি"—ডাশা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো।

কাটিয়া একে একে তার কোটের বোতাম খুলে ফেললো, খসে পড়লো কোট, শানিত তলোয়ারের মত তার দীপ্তদেহ বেরিয়ে এল।

"ইস্ জুতোটা কি ভেজাই ভিজেছে! দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তবে ত একটা গাড়ী পেলাম। ততক্ষণে জামা, কাপড়, জুতো সব ভিজে চুপ্‌চুপে।"

"কাটিয়া, কোথায় ছিলে তুমি"—ডাশার স্বরে দৃঢ়তা।

"এক সাহিত্যের মজলিসে—কি উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে বলতে পারব না। যাই, ঘুমোইগে! বড় ক্লান্ত।—"

ডাইনিং রুমে এসে চামড়ার ব্যাগটা কাটিয়া ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, "এ কি, ফুলগুলো কে ছিঁড়েছে? নিকোলাই কোথায়? শুয়ে পড়েছে বোধ্ হয়?"

ডাশা অবাক হয়ে গেল। ভ্রষ্টা মেয়ের মত ত তার আচরণ নয়!

"কাটিয়া!"

"কী হয়েছে বোন?"

"আমি সব জানি।"

"কি জান তুমি? কি হয়েছে ঈশ্বরের দোহাই বল?"

"নিকোলাই আমাকে সব বলেছে।"

ডাশা বোনের মুখের পানে তাকালো না।

"নিকোলাই কী বলেছে তোমাকে?" ঝাঁঝিয়ে উঠলো কাটিয়া।

"সে ত তুমিই জান কাটিয়া।"

"না, আমি জানি না।"

ডাশা কাটিয়ার পায়ের কাছে বসে বল্লো, "তাহ'লে মিথ্যে, কাটিয়া নিকোলাই যা বলেছে মিথ্যে! বল, বল কাটিয়া।"

তার হাত চুমোয় চুমোয় ভরে দিল ডাশা।

কাটিয়া তাকে হাত ধরে তুলে বললো, "মিথ্যে, তুমি যা শুনেছ বোন, সব মিথ্যে। কেঁদোনা। কাল যে আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। কেঁদে কেঁদে চোখ যে ফুলিয়ে ফেলেছো।"

কাটিয়া তার ঠোঁঠ বুলিয়ে দিল ডাশার চুলে।

"আমি কি বোকা কাটিয়া।" ডাশা মুখ গুঁজলো কাটিয়ার বুকে।

"ও মিথ্যে কথা বলছে" নিকোলাই আইভানোভিচের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওরা ফিরে তাকালো দু'জনে, স্টাডির দরজা বন্ধ।

কাটিয়া বল্ল: "যাও ঘুমওগে ডাশা। আমি ওর সংগে বোঝা-পড়া করবোনি। চমৎকার। ক্লান্ত হয়ে এলাম, কোথায় নিশ্চিন্তে ঘুমুব, তা নয়—"

ডাশা চলে গেল। কাটিয়া স্টাডির দরজায় করাঘাত করে বল্ল, "নিকোলাই, দোর খোল।"

উত্তর নেই। থম্‌থমে নীরবতা, চাবি ঘোরাবার শব্দ, দরজা খুলে গেল। কাটিয়ার দিকে পেছন করে নিকোলাই চেয়ারে বসে আছে। বইয়ের পাতা কাটছে একটা হাতির দাঁতের ছুরি দিয়ে। কাটিয়া সমুখের ডিভানটায় বসে পড়লো, হাতের রুমালখানা ব্যাগে পুরে বন্ধ করলো। শব্দ হল খুট। নিকোলাইর কপালের ওপর একগোছা চুলে একটু দোলা।

'একটা কথা আমি বুঝতে পারিনা', কাটিয়া ঝাঁঝালো স্বরে বল্ল, 'তুমি যা ইচ্ছে আমার সম্বন্ধে ভাবতে পার, কিন্তু তোমার ঐ কুৎসিত ভাবনার ভাগ ডাশাকে না দিলে কি চলত না?" চেয়ার ঘুরিয়ে মুখোমুখী হয়ে বসলো নিকোলাই।

"কি, আমার ভাবনা কুৎসিত, একথা বলতে সাহস কর?"

"হাঁ, করি।"

"চমৎকার। রাস্তার মেয়েদের মত যার আচার-ব্যবহার—"

"থাক্ থাক্, কবে থেকে তুমি আমার সমন্ধে এমন খারাপ ধারণা পোষণ করছ?"

"আমি জানতে চাই, সব ঘটনা জানতে চাই।"

"কি জানতে চাও?"

"জান না, কি জানতে চাই?"

"বুঝেছি কোথায় ঘা পড়েছে তোমার।" ক্লান্ত তার স্বর। "কিছুদিন আগে আমিই বলেছিলাম সেকথা·· মনে ছিল না।"

"আমি জানতে চাই কার সংগে—"

"জানি না।"

"মিথ্যে বলোনা কাটিয়া।"

"মিথ্যে নয়, তুমি চাইছ আমায় মিথ্যে বলাতে। রাগ করে সেদিন বলেছিলাম, কিন্তু আজ সে কথা আমার মনে নেই।"

নিকোলাইর মুখ ভাবলেশহীন কিন্তু হৃদয়ে উঠেছে তুফান। না, কাটিয়া অবিশ্বাসিনী নয়! এবার সে কাটিয়াকে এক দীর্ঘ উপদেশ দেবার সুযোগ পেয়েছে! পত্নীর ধর্ম, নৈতিক অবনতি, আত্মার ব্যর্থতা, রক্ত দিয়ে রোজগার করা টাকার অমিতব্যয় (কাটিয়া বল্ল, "রক্ত দিয়ে নয়, জিভ নেড়ে রোজগার-করা টাকা".), ছবি-কেনা প্রভৃতি তার দীর্ঘ উপদেশের বিষয়ীভূত হল। নিকোলাই আত্মার গুরুভার এমনি করে লাঘব করলো। চারটের সময় থামলো তার বকবকানি। কাটিয়া নিজের শোয়ার ঘরে চলে গেল। নিকোলাই বিছানায় শুয়ে ভাবলো, বড্ড বেশী বলা হয়েছে! কি একটা শব্দে মনে হল, কাটিয়া কাঁদছে! ওঘরে একবার যাওয়ার জন্যে উঠতে গেল বিছানা ছেড়ে; কি ক্লান্তি! চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে।

ডাশা বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো: যাক্, গোলমাল মিটে গেছে! এইবার ঘুম।

কাটিয়ার চোখে ঘুম এলোনা সে রাত্রে। ক্লান্ত দেহকে সে বিছিয়ে দিল শয্যায়, সে রাতে সে তিনবার কাঁদলো। একবার তার অসুস্থ দেহ, অপবিত্র, অসুখী মনের জন্য। ডাশার মত নির্দোষ দেহ আর মন সে ফিরে পাবে না। আবার সে কাঁদলো, নিকোলাই তাকে রাস্তার মেয়েদের সংগে তুলনা করেছে! সে রাস্তার মেয়ে! তিন বারের বার সে কান্নায় উত্তাল হয়ে উঠলো, ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না! কাল মাঝরাতে বেসনভের কাছে শহরতলীর এক হোটেলে সে তার দেহ বিকিয়ে দিয়েছে। বেসনভ তাকে অপমান করেছে। তার অংগে অংগে ছিল না কামনার শিহরণ, কথায় ছিল না প্রেমিকের অনুরাগ। তবু সে তাকে দেহ দিয়ে এল। বেসনভ তাকে গ্রহণ করলো, যেন সে রক্তমাংসে গড়া মানুষ নয়, পুতুল, শো-কেসে সাজানো পুতুল!

চার

ভ্যাসিলিয়েভস্কি পাড়ায় পাঁচতলা বাড়ীর সবচেয়ে উপরের তলায় ইঞ্জিনিয়ার আইভান ইলিচ তেলেগিণের আস্তানা। তার বন্ধু স্যাপজকভ আস্তানার নামকরণ করেছে 'জীবন যুদ্ধ সংঘ'। এখানকার সভ্যরা সবাই জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত। আলেকজাণ্ডার আইভানোভিচ জিরভ, আইন কলেজের ছাত্র; আনটোস্কা আর্ণলডভ, সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার; ভ্যালিয়েট শিল্পী; এলিজাবেথা কিয়েভনা, পছন্দ-সই কোনো জীবিকা নির্বাহের পথই সে এখনো খুঁজে পায়নি। আর আছে বক্তা স্যাপজকভ।

এখানে সবাই দেরী করে ওঠে। তেলেগিণ কারখানা থেকে কাজ সেরে যখন প্রাতরাশ খেতে আসে, তখনও সবাই ওঠেনি। তাড়াতাড়ি ওঠবার তাদের প্রয়োজন কি? জীবন চলেছে মন্দাক্রান্তা তালে। আনটোস্কা আর্ণলডভ বেলায় বেরিয়ে যায় নেভস্কির কোনো কাফেতে, সেখান থেকে সংবাদ-পত্রের আফিস। ভ্যালিয়েট নিজের প্রতিকৃতি আঁকতে বসে, স্যাপজকভের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে নতুন শিল্পের ধারা নিয়ে প্রবন্ধ লিখছে। জিরভ আর এলিজাবেথা বসে বসে জীবনের নানা জটিল সমস্যার সমাধান করে। এলিজাবেথা ওকে প্রতিভাবান বলে মনে করে। যখন জিরভ থাকে না, সে স্কার্ফ বোনে, মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওঠে, কখনও বা চুল আঁচড়ায় নানা ছাঁদে। এলিজাবেথার চুল-আঁচড়ানোর একটু বিলাসিতা দেখা যায়, পোষাক সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন। আস্তানার বাসিন্দেরা পর্যন্ত এজন্য ওকে তিরস্কার করেছে।

কোনো নতুন লোক দেখা করতে এলে, এলিজাবেথা তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যায, তারপর শুরু হয তার কথার চাতুর্য; হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসে, "তার (অতিথির) কি কখনো খুন করবার ইচ্ছে হয়েছে?" অতিথি অবাক্ হয়ে যায়।

তেলেগিণের আস্তানার অধিবাসীরা এলিজাবেথার দরজায় তার হত্যা সম্বন্ধে অদ্ভুত প্রশ্নগুলো লাল কালি দিযে লিখে এঁটে দিযেছে। এলিজাবেথা একটু চটেনি, বরং খুসীই হয়েছে। এইত তার জীবন—বদ্ধ জলার মত নিস্তরংগ, উত্তেজনাহীন। উত্তেজনা চাই—তাই সে কল্পনায় সৃষ্টি করেছে এক জগত, বারুদের কটু গন্ধে যার হাওয়া ভারাক্রান্ত, রক্তে লাল যার মাটি।

উত্তেজনা চাই!

সেবার বড়দিনে স্যাপজ্‌কভ সবাইকে ডেকে বল্ল, "ভাই সব, কেমন যেন ঝিমিযে পড়েছি আমরা। এস, আমরা বুর্জোয়া সমাজের মূলে এক যোগে আঘাত করি। আমরা নতুন যুগের কলম্বাস! বুর্জোয়া সংস্কার মিলিয়ে যাবে আমাদের মিলিত ফুৎকারে। আমরা চাই না ধর্ম, চাই না সম্পত্তি, বিবাহ আমাদের জন্য নয়, আমরা বেরিয়ে আসব বুর্জোয়া কোটর থেকে, নগ্নতা হবে আমাদের ভূষণ, আমরা হব আদিম!"

স্যাপজকভ বক্তৃতা শেষ করে বল্ল যে, তাদের একটা মাসিক পত্র বার করা দরকার। টাকা কিছু সংগৃহীত হল তখনি, কিন্তু কাগজ বার করবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সভারা সবাই প্রতিজ্ঞা করলো, বুর্জোয়াদের কাছ থেকে যে করে হোক ছিনিয়ে নিতে হবে বাকি টাকা।

দেখতে দেখতে টাকা সংগ্রহ হল, আত্মপ্রকাশ করলো 'দেবতাদের খাদ্য'। সমস্ত সহর তোলপাড়! রক্ষণশীলরা নিন্দায় পঞ্চমুখ হল, আধুনিকরা বল্ল, চমৎকার!' দ্বিতীয় সংখ্যা বেরবার পর তারা ঠিক করলো, সান্ধ্য-অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

এমনি এক সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে ডাশা এল তাদের আস্তানায়। জিরভ তাকে অভ্যর্থনা করে হল ঘরে নিয়ে গেল। কি নোংরা! এখানে ওখানে ছেঁড়া, নোংরা জামা-কাপড় স্তূপীকৃত, কেমন একটা ঘেমো গন্ধ! ডাশা রুমাল দিয়ে নাক চাপলো।

'কোন এসেন্স আপনি ব্যবহার করেন?'—জিরভ বল্ল।

ডাশা কোনো উত্তর দিল না।

তারপর সান্ধ্য-অনুষ্ঠান! কাঠের সরু সরু বেঞ্চিতে বসে ওরা আবোল-তাবোল বকে গেল। কত কবিতা, কোনোটা মোটার নিয়ে, কোনটা বা এযারোপ্লেন, এক লাইনও বোঝা যায় না। ভ্যালিয়েট দেখালো তার ছবি: অশ্লীল অবয়বের মিছিল, বিদ্‌ঘুটে, বিদ্‌ঘুটে! সাহিত্যিকরা পড়লো, গল্প। গল্পত্ব তাতে নেই, আছে কামনা, অশ্লীলতা, গীর্জা আর ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ। এর মধ্যে শুধু একজনকে তার ভালো লাগলো, সে তেলেগিণ।

তেলেগিণ তার কাছে এসে বল্ল, "অতি ক্ষুদ্র আমাদের আয়োজন, তবু একটু চা খেয়ে যেতে হবে।"

ডাশা তার সংগে উঠে খাবার ঘরে গেল। নোংরা থালা বাসন পড়ে আছে টেবিলের উপর। ওরই মধ্যে জায়গা করে তারা বসলো। তেলেগিণ পকেট থেকে রুমাল বার করে টেবিলটা মুছে কিছু স্যাণ্ডউইচ আর চা দিল তাকে।

ডাশা চায়ে একটু চুমুক দিল। তেলেগিণ মাষ্টার্ডের বাটিটা নিয়ে নাড়ছিল। ডাশা তাকালো তার দিকে। দাড়ি গোঁপ-কামানো চকচকে মুখ, রৌদ্রপক তামাটে রং, চোখে লজ্জিত দৃষ্টি। ডাশার কেমন যেন ভালো লাগলো তেলেগিণকে, শুধালো, "আপনি কোথায় কাজ করেন?"

তেলেগিণ চোখ তুলে তাকালো, মুখ লজ্জা-বঙ্কিম:

"বাল্‌টিক কোম্পাণীতে।"

"ভালো লাগে কাজ করতে?"

"হাঁ, ভালোই লাগে,।"

"শ্রমিকরা নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালোবাসে?"

"উপরওলার চাপে তাদের উপর মাঝে মাঝে খারাপ ব্যবহার করতে হয়।"

"আচ্ছা, আজকের এই সান্ধ্য-অনুষ্ঠান ভালো লাগলো আপনার?

'পাগলামি!' হাসিতে তেলেগিণের মুখ ভরে গেছে, "কিন্তু বড় ভালো লোক ওরা।"

"কিন্তু এই অশ্লীলতা, এই পাগলামী, আমার ভালো লাগে না।"

তেলেগিণের মুখের উপর ঘনিয়ে এল তীব্র অনুশোচনার ছায়া, মুখে কিছু সে বলতে পারলো না, মাথা নিচু করে রইলো।

এলিজাবেথা ঢুকলো ঘরে। ডাশার কাছে এসে বল্ল, "আপনাকে আমি চিনি। আমাকে কিয়েভনা বলে ডাকবেন, এ ছাড়া আমার কিই বা পরিচয়।"

দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো, ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে গেছে।

একটা চেয়ার টেনে এলিজাবেথা ডাশার পাশে বসে বল্ল, 'আপনার এত সুন্দর চেহারা! কত লোক হয়ত প্রেমে পড়েছে। কিন্তু পরিণাম কি হবে? হয়ত বুড়ো থুথ্‌ড়ো এক বুর্জোয়ার সঙ্গে বিয়ে হবে, হবে সন্তান, তারপর মৃত্যু! সত্যিই, জীবনটা কী একঘেয়ে, কী বিশ্রী!"

"আপনার কাছে ভবিষ্যৎ জানতে আমি চাই না"—ডাশা উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

এলিজাবেথা হাসলো, 'চটবেন না, আমি আবার একটা মানুষ! আমার কথায় চটে কেউ! কেউ আমাকে দেখেও দেখে না। তেলেগিণ কথা কয়, সেও করুণা করে।"

"কি সব বাজে কথা বলছ লিজা?"—তেলেগিণ প্রতিবাদ জানালো।

"কত ঝড় বয়ে গেল," ডাশার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, "কত ঝড়। একজনকে আমি ভালবাসতাম, তখন বালটিক সাগরের পারে থাকি। একদিন রাতে ঝড় এল। বল্লাম, চল সমুদ্রে। রাজি হল, আমার প্রতি করুণায়, তারপর মত্ত সাগরের বুকে নৌকোয় পাড়ি। কী আনন্দ, নিষ্ঠুর আনন্দ। জামা কাপড় খুলে ফেলে তাকে বল্লাম—"

"লিজা, তুমি নিজেই জানো তুমি মিথ্যে কথা বলছ," তেলেগিণ বললো।

লিজা হাসতে লাগলো, হাসতে হাসতে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লো! কাঁপছে, লিজা কাঁপছে!

ডাশা উঠে দাঁড়ালো। তেলেগিণ তাকে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে এল। বাইরে বরফ পড়ছে, পথ ভেজা। ডাশার স্লেজ মিলিয়ে গেল কুয়াশায়, তেলেগিণ তাকিয়ে রইলো।

খাবার ঘরে ফিরে এসে দেখলো, লিজা তখনও টেবিলের ওপর পড়ে আছে মুখ গুঁজে। তেলেগিণ ডাকলো, 'লিজা'।

লিজা মুখ তুলে চেয়েছে।

"কেন তুমি সবাইকে বিরক্ত কর।"

"প্রেমে পড়েছ তুমি,"—লিজা তেলেগিণের দিকে তাকালো।

"কি মাথামুণ্ডু বকছ?"

"দুঃখিত, আমি দুঃখিত," লিজা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডাশা তেলেগিণের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভুলে গেল। অমন কত লোকের সঙ্গেই ত দেখা হয়। কিন্তু তেলেগিণ ভুলতে পারলো না। কালো পোষাক, মুখে চোখে বনেদি বিরক্তির ছাপ, ছাই রংএর চুল বারবার তার মনে পড়তে লাগলো।

কিছুদিন হল উনত্রিশ বছর তার পূর্ণ হয়েছে। এরই মধ্যে ছ'বার সে পড়েছে প্রেমে। কাজানে স্কুলে পড়ত, তখন ভালো বাসে মারুসাকে। কিন্তু তারপর অপেরা অভিনেত্রী স্যাডা টিম্নে! উন্মাদ হয়ে গেল তার জন্যে। পিটার্সবুর্গে এল ভিলবুসা। এক সঙ্গে তারা ডাক্তারী পড়ত। তারপর জিনোচকা, সর্বশেষ ওলিয়া কোমোরভা। সে দিন কবরে তাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছে।

কিন্তু ডাশার প্রতি তার অনুভূতির যেন পুরোনো প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে কোন মিল নেই, লিজা বলেছে, সে প্রেমে পড়েছে। কিন্তু একি প্রেম! পাষাণ প্রতিমা কিংবা ভেসে যাওয়া মেঘের সঙ্গে কি কেউ প্রেমে পড়তে পারে?

মার্চের শেষে অকালে পড়েছে বসন্তের সাড়া। বরফ গলে গেছে, পথে পথে আবার ভিড়, আকাশে নীল রং দেখা দিয়েছে, গাঢ় নীল রং। এমনি একদিনে তেলেগিণ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো।

"যাই বল জীবনটা খুব খারাপ নয়?"

বসন্তের হাওয়া ওর তিরিশ বছরের জীবনকে উত্তাল না করুক, দোলা দিয়ে গেছে নিঃসন্দেহ!

পথে বেরিয়েই ডাশার সঙ্গে দেখা। নীল রঙের পোষাক তার পরণে, মুখে আনত পুষ্পের বিষণ্ণতা। ডাশা ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। তেলেগিণ শুধু ক্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। নাম-না-জানা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে এসেছে, মাথা ঘুরছে।

তেলেগিণ আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো, আবার ডাশা। টুপির ডেইজি ফুল বাতাসে দুলছে, সূর্যের আলো ঝলমল করছে মুখে।

তেলেগিণ টুপি তুলে অভিবাদন জানালো:

"কি চমৎকার দিন, ডারিয়া দিমিত্রিভ্না।"

একটু চমকে উঠলো ডাশা। তারপর ঠাণ্ডা চোখতুলে তাকালো, মুখে মৃদুহাসি।

"আপনার কথাই আজ ভাবছিলাম যে। চলুন না, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবেন।

ওরা গলিতে ঢুকলো। পাশাপাশি চলেছে দু-জনে।

হঠাৎ ডাশা বল্ল, "একটা প্রশ্ন আপনাকে করব?"

"বলুন।"

খুব সুন্দরী, অতি চমৎকার ব্যবহার, বিবাহিতা—এমনি কোনো মেয়ে যদি ব্যাভিচারিণী হয়, তাকে কি ক্ষমা করা যায়?

"না।"

"কেন?"

"কেন ভেবে দেখিনি! কিন্তু হৃদয় বলে, ক্ষমা করা যায় না।"

"যায় না, যায় না তা আমি জানি, কিন্তু তবু আমি ভাবছি, ক্ষমা করা যায় কিনা!"

কথা বলতে-বলতে ওরা বাড়ির সমুখে এসে গেছে। "বিদায়!" আপনার উত্তরের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু তবুও মন শান্ত হচ্ছে না। একদিন আসবেন আমাদের এখানে।"

ডাশা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পাঁচ

ঘরের দোর খুলতেই এক ঝুড়ি সদ্য ফোঁটা ভায়োলেট ডাশার চোখে পড়লো।

কে পাঠালো ফুল? নাম নেই, শুধু লেখা 'ভালোবাসা'।

ডাশা পরিচারিকাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "কে ফুল পাঠালো?"

"কর্ত্রীকে কে পাঠিয়েছে। তিনি আপনার ঘরে রেখে দিতে বল্লেন।"

ডাশা ফিরে গেল তার ঘরে। সূর্য ডুবেছ; আকাশে দেখা দিয়েছে তারা। নিচে রাস্তার ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলো। অন্ধকারকে উৎক্ষিপ্ত করে একটা মোটার চলে গেল। ঘর ভায়োলেটের গন্ধে ম'ম' করছে। কাটিয়ার প্রেমিকের পাঠানো ফুল। কোথায় এক ব্যাভিচারী উর্ণনাভ জাল বুনছে, সেই জালে ধরা পড়েছে কাটিয়া।

হঠাৎ ব্যথিয়ে উঠল তার বুক, তার সরু সরু আংগুল দিয়ে সে যেন ছুঁয়েছে কোন গোপন ক্লেদ, ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধে সে পুড়ে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে; সমস্ত দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সংগীত, "বাঁচতে চাই, ভালোবাসতে চাই, চাই পৃথিবীর সুখ ··· আমার ··· আমার ··· পৃথিবী আমার।"

সংরক্ষণশীল মন মাথা চাড়া দিয়ে বল্ল, "না, না কুমারী তুমি।"

ডাশা চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলো।

দু-সপ্তাহ কেটে গেছে। কাটিয়া আর নিকোলাই আবার ফিরে গেছে তাদের সহজ জীবন যাত্রায়। কাটিয়া বসন্তের পোষাক তৈরীর আয়োজন করছে; নিকোলাই মেতেছে নাটক অভিনয়ের হুজুগে। ডাশা শুনেছে, এই অভিনয়ের পয়সা নাকি বলশেভিকদের দেয়া হবে—তারা এখন প্যারিতে বসে আছে। পুরোদমে সান্ধ্য ভোজ চলছে। আর ডাশা—?

ডাশা ভাবছে। রাত আর দিন ভাবনার জাল তাকে জড়িয়ে ধরেছে। কার ভাবনা? বেসনভ, বেসনভ! সয়তানের মত বেসনভের ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। সে আর পারে না!

ডাশা বিছানায় উপর এলিয়ে দিল দেহ। নরম অন্ধকারে ঘর ভরে গেছে। ঘড়িটা করছে টিক্ টিক্। দূরাগত দরজা বন্ধ করার শব্দ।

"অনেকক্ষণ ফিরেছ ?"

ডাশা উঠে বসল। কাটিয়া তাকে ডাকছে।

একি, মুখখানা যে লাল হয়ে গেছে।—কাটিয়া বল্ল, "আমার ঘরে চল।"

কাটিয়া ঘরে এসে আলমারি গোছাতে বসলো।

"কেরেনস্কির বৌএর সংগে ঝগড়া। অভাব, সেই অভাবের কথা! টিমিরিয়াজেভদের বাড়ি শুদ্ধু হাম। সিনবার্গের বৌয়ের সংগে বনিবনা হল এতদিনে"—এমনি নানা কথা কাটিয়া বলে গেল। ডাশা হঠাৎ বলে বসলো, "আমার ভালো লাগে না।"

কাটিয়া অবাক হয়ে গেল।

"কি হয়েছে ডাশা? প্রেমে পড়েছ বোধ হয়।"

"প্রেম কিনা আমি জানিনা। কিন্তু সে আমাকে নিয়ে যা খুসি তাই করতে পারে।"—ডাশা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"কে সে?"

"বেসনভ।"

কাটিয়া ডাশার পাশে এসে বসলো। তার হাত ওর কাঁধে। অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। তবু ডাশার মনে হল, কি এক সাংঘাতিক কথা সে উচ্চারণ করেছে।

"যে যা খুসি করতে পারে। আর আমি শুধু শুনব, ঝুড়ি ঝুড়ি প্রেম আর ব্যাভিচারের গল্প?" ডাশা শাণিত হয়ে উঠলো ক্রোধে।

"বেসনভ। তুমি চেননা তাকে,"—কাটিয়া বল্ল, "শুনছ"?

"হাঁ।"

"সে তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে।"

"করুক, উপায় কি। আমি তার জালে ধরা পড়েছি।"

"কি বাজে বকছ?"

ডাশার ভালো লাগছিল এমনিধারা কথাবার্তা। বেসনভকে সে কোনো দিন ভালোবাসে নি। একদিন রাত্রে শুধু একটা উন্মাদনা এসেছিল, কিন্তু আজ আর তার লেশমাত্র নেই। তবু কাটিয়ার উত্তেজনা, ব্যাকুলতা তাকে এক নিষ্ঠুর আনন্দে বিহ্বল করে তুলেছিলো। কিন্তু আর নয়, ডাশা কাটিয়াকে বলতে গেল, 'তুমি কি বোকা কাটিয়া!' কাটিয়া তাকে সে সুযোগ দিলোনা। তার হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বল্লে, "আমায় ক্ষমা কর ডাশা, আমায় ক্ষমা কর!"

ডাশা ভেবে পেল না, ক্ষমার কথা কেন বলছে কাটিয়া?

ডিনারের পর নিকোলাইর পরামর্শে ওরা গেল এক সরাইখানায়, সংগী হল চিবভা।

'নর্দার্ণ পামিরা'। বিরাট পানশালা। টেবিলে টেবিলে সান্ধ্য পোষাক-পরা পুরুষ আর যুবতীদের ভিড়। ডাশা শ্যাম্পেনের গেলাসে চুমুক দিয়ে একবার চারদিকে তাকালো। চোখ-ধাঁধানো আলো, আর হাসি ছড়িয়ে পড়ছে, ঝরণার জলের মত। ও কে? শূন্য বোতল সামনে রেখে চোখ বুজে বসে আছে, প্লেটে মাছের খোলা! হয়ত ভাবছে, এখুনি আলো নিভবে, তারপর মৃত্যু—ঠাণ্ডা মৃত্যুর জিভের ছোঁয়াচ।

পর্দা সরে গেল। একটি বেঁটে জাপানী বল লোফালুফি করছে।

কাটিয়া কেন ক্ষমা চাইলে?

তা হলে কি—? ডাশার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে এল! তাহলে কি? কাটিয়ার দিকে তাকালো।

টেবিলের ওপাশে কাটিয়া। এত চমৎকার দেখাচ্ছে!

রাত দুটোয় ওরা বেরুল।

বেরুবার মুখে একটা টেবিলে বেসনভকে ডাশা দেখতে পেল। আকুনদিন শুনছে, আর বেসনভ বিড় বিড় করে বকে চলেছে। একটা কথা কানে এল, "শেষ, সব শেষ।" আর দেখা গেল না, ওয়েটারের বিরাট দেহের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

পথে বেরুতে ওরা টের পেল বরফ পড়ছে। সূক্ষ্ম শাদা ফুলের মত ঝরে ঝরে পড়ছে বরফ। তীক্ষ্ণ অথচ মধুর। গাঢ় নীল আকাশের বুকে চাঁদ, তারার সার মিহি কুয়াশার আবরণে ঢাকা। ওর পেছন থেকে কে যেন বল্ল, "অদ্ভুত রাত!" একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ডাস্টবিনের আড়াল থেকে উঠে এল এক কংকাল, পরণে তার ফালি ফালি ন্যাকড়া। ডাশার জন্যে দরজা খুলে দিল। ডাশা পথের আলোয় দেখলো, কি বীভৎস মুখ!

"অভিনন্দন বন্ধুগণ, কামনার মন্দিরে একটি রাতের যে বিলাস আদায় করে ফিরছ, অভিনন্দন তারই জন্য!"—রুক্ষ, কর্কশ স্বর, রাতের কন্দরে কন্দরে ছড়িয়ে পড়লো। দুটো কপেক কে ছুঁড়ে দিল তার দিকে, সে ছেঁড়া টুপিটা তুলে অভিবাদন জানিয়ে মিলিয়ে গেল। ডাশার মনে হল অন্ধকারের বুকে সেই বন্য কালো চোখ দুটো এখনো তার দিকে চেয়ে আছে।

পরদিন রাত্রে তারা থিয়েটার দেখতে গেল। নাটকের প্রথম রজনী। নিকোলাই বারবার তাদের সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। থিয়েটারে যখন পৌঁছল, তখন অভিনয় শুরু হয়েছে।

একটা গাছের তলায় নকল দাড়ি-পড়া প্রেমিক মেয়েটিকে জানাচ্ছে প্রেম!

"সোফিয়া, আমি তোমাকে ভালোবাসি"।

বিয়োগান্ত না হলেও ডাশার ইচ্ছে করছিল কাঁদতে। কেমন ধারা নায়িকা! স্বামীকে ভালোবাসে, তবু একটা ইতরের সংগে চলে গেল। আর স্বামী পুড়িয়ে ফেলল তার সমস্ত জীবনের সাহিত্য সাধনা। প্রথম অংক এই খানেই শেষ।

বক্সে ভিড় করেছে পরিচিতের দল। দ্রুত কথা চলছে।

শিনবার্গ বল্ল, সেই পুরোণো যৌন সমস্যা—কিন্তু বলবার ভংগী জোরালো।

ডিউরভের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে বল্ল, "ওটা একটা সমস্যাই নয়, ও নিয়ে রাশিয়ার মাথা ঘামাবার সময় নেই।"

রাজনীতির দিকে এবার মোড় ঘুরলো। কুলিচক ফিস্ ফিস্ করে বর্ণনা করলো, রাজ সভার কোনো কলংক কাহিনী।

শিনবার্গ চিৎকার করে উঠলো, "দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন!"

"বিপ্লব", নিকলাই আইভানোভিচের স্বর শোনা গেল, "বিপ্লব আমরা চাই! নইলে মরব আমরা।" তারপর নিচু গলায়ঃ "কারখানায় শ্রমিকদের ভেতর অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।"

ডাশার বিরক্তি ধরে গেছে। নিচের স্টলের দিকে সে তাকিয়ে রইলো। তেলেগিণনা? হাঁ, ঐত কালো কোট গায়ে, হাতে প্রোগ্রাম! তেলেগিণ টুপি তুলে অভিবাদন জানালো ডাশাকে।

"কাটিয়া, তেলেগিণ এসেছে।"

"চমৎকার লোক।"

"শুধু চমৎকার নয়, যথেষ্ট পড়া-শুনোও করেছে।"

অন্ধকার হয়ে এসেছে প্রেক্ষাগৃহ। পর্দা উঠলো। ডাশা মুখে পুরলো একটা চকোলেট।

·· নায়ক পুড়িয়ে ফেলবে তার পাণ্ডুলিপি। ফেললেইত চুকে যায়! টেনে-বুনে আরও তিন অংক তবু নিয়ে যাওয়া চাই!

ডাশা মঞ্চ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ছাদে আঁকা মেয়েটাকে এবার সে দেখতে পেল। মেঘের ভেতর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে চলেছে এক নগ্ন-প্রায় মেয়ে। হাসির ঝলক মুখে। ডাশার মনে হল, ওরই মত দেখতে মেয়েটি। ওর শুধু হাসি নেই মুখে! একঘেয়ে জীবন! অসাধারণ কিছুর আকস্মিক আবির্ভাব সে চায়। মনে মনে সে বললোঃ "যাব, যাব, যাব, আমি তার কাছে যাব।"

সেদিন থেকে ডাশার মনে আর একতিল সন্দেহও রইলো না। বেসনভের কাছেই তাকে যেতে হবে। কিন্তু কবে? সে শিউরে উঠলো। একবার ভাবলো, সামারায় চলে যাবে; কিন্তু চিন্তা করে দেখলো, হাজার মাইল দূরে গেলেও এই প্রলোভন থেকে সে মুক্তি পাবে না।

তা'র কুমারী মন আহত হল, কিন্তু যে দ্বিতীয় জীব শরীরের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, সে চায় বেসনভকে। বেসনভ যে ওকে চায় না, কামেন্নুউসট্রভ্স্কি প্রস্পেক্টে বসে যে এক অভিনেত্রীকে নিয়ে কবিতা লেখে, তার কাছেই ডাশাকে যেতে হবে।

নিজের উপর তার ঘৃণা হল। চুল সে আর ভাল করে বাঁধে না, বাক্স থেকে বের করেছে পুরোণো পোষাক; রাতদিন পড়ছে রোমক আইনের বই। অতিথিরা এসে তার দেখা পায় না। ডাশা ভয় পেয়েছে।

এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় ডাশা ছুঁড়ে ফেলে দিল তার আইনের বই। ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। সমুদ্রের লবণাক্ত হাওয়া বইছে, মজ্জায় মজ্জায় এনেছে বসন্তের আহ্বান গীতি। ডাশা আনমনে ঘুরলো সহরের অলিতে গলিতে। জলের দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। আকাশের সূর্যাস্ত সে দেখলো। তারপর কামেন্নুউসট্রভ্স্কি প্রস্পেক্ট। পথে পথে আলো, গাড়ীর শব্দ, গানের স্বর: ওয়ালৎস্, সোনাটা, আরও কত···বাতাস ও যেন গান গাইছে শান্ত নীল সন্ধ্যায়। ডাশার হৃদয় শান্ত, নিস্তরঙ্গ। ডাশা মোড়ে এসে বেঁকলো, পথের আলোয় পড়লো বাড়ির নম্বর। হাঁ এই ত বাড়ি! অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে উঠে এল। পেতলের সিংহের মুখের ভেতরে একটা ছোট্ট কার্ড আঁটা, কি নাম? বেসনভ। দৃঢ় হাতে ডাশা বেল টিপলো।

ছয়

রেঁস্তরা ভিয়েনা। পরিচারক কোট খুলে নিয়ে বেসনভকে বল্ল—

"আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন!"

"কে?"

"একজন মেয়ে।"

"পরিচিত কেউ?"

"কোনোদিন তিনি আর আসেননি—"

বেসনভ একবার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রেস্তরাঁর অন্য প্রান্তে চলে গেল।

"কি চাই আপনার? আজ ভালো ম্যটন আছে।"

"শাদা মদ নিয়ে এস," বেসনভ বল্ল। বসেই তার মনে হল, অনুপ্রেরণা এসেছে, রুমানীয় বেহালার সুরে, মেয়েদের গায়ের মৃদু এসেন্সের গন্ধে, স্তনের অশ্লীল প্রকাশে সেই অনুপ্রেরণা যেন আস্তে আস্তে দেহ পাচ্ছে। দিনের এলোমেলো ছেঁড়া-খোঁড়া ভাবগুলো সুসংবদ্ধ হয়ে গেছে।

বেসনভ এক চুমুকে গ্লাস শেষ করলো। অনুপ্রেরণার ঐক্যতান শুরু হয়েছে তার মগজে।

একধারে এক টেবিলে বসে ছিল স্যাপজকভ, আনটোস্কা আর এলিজাবেথা। কাল এলিজাবেথা চিঠি লিখেছে বেসনভকে এইখানে দেখা করতে। বেসনভ ঢুকতেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

"সাবধান," বল্ল আনটোস্কা, "লিজা সাবধান। বেসনভের অভিনেত্রী বিদায় নিয়েছে।"

এলিজাবেথা নিঃশব্দে হাসলো—কয়েক মাস ধরে তার জীবন আরো দুর্বহ হয়ে উঠেছে। কিছুই করবার নেই; কোনো আশা নেই। তেলেগিণ তাকে করুণা করে। কতদিন রাতে শুয়ে শুয়ে সে ভেবেছে, তেলেগিণ যদি একবার আসে তার শয্যায়। কিন্তু বৃথা আশা! সব আশা ছেড়ে দিয়ে সে বেসনভের কবিতার বই কিনলো। বই পড়ে একদিন সে বল্ল, "বেসনভ এক বিস্ময়কর প্রতিভা।"

তেলেগিণের দল রুখে দাঁড়ালো। বেসনভ প্রতিভা! পচা গলা বুর্জোয়া সমাজের বুকে এক ছত্রক ছাড়া কিছুই নয়।

তারপর এই চিঠি। বেসনভের কাছে গিয়ে এলিজাবেথা বললো, 'আমি আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন, কেন?'

"না," বেসনভ বল্ল, "কোনো প্রশ্নই করব না। একটু মদ খাবেন?"

"আর প্রশ্ন করলেও আমি কোনো কারণ দেখাবোনা। শুধু একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্রের ইচ্ছে ছাড়া কিছুই নয়।"

"কি করেন আপনি?"

"কিছু না—"এলিজাবেথা হাসলো, "বেশ্যা হলেও তো সেই একঘেয়ে জীবন, তাই হইনি। শেষের দিন পর্যন্ত আমি এমনি থাকবো। অদ্ভুত ভাবছেন ত?"

"বুঝতে চেষ্টা করছি আপনাকে?"

"আমি বিস্ময়। আমি মরীচিকা—"

বেসনভ ভাবল, নির্বোধ! তবুও ওর আলুল চুলে মাদকতা, পুষ্ট অনাবৃত কাঁধে কুমারীর পবিত্রতা! বেসনভ ওর দিকে চেয়ে হাসলো। তার কালোকল্পনার ধোঁয়ায় এই সরলা মেয়েটিকে সে আচ্ছন্ন, অভিভূত করে দেবে।

'রাশিয়ার উপর রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে,' বেসনভ বল্ল।

এলিজাবেথা শুনলো না ওর কথা। ওর ঠাণ্ডা চোখ, ওর মেয়েলীমুখ সে দেখছিল। দূর থেকে তাকে স্যাপজকভ ইসারা করলো।

"ওরা?"

"বন্ধু।"

"দেখুন, অমন ইসারা আমি পছন্দ করিনে।"

"চলুন না কোথাও যাই।" এলিজাবেথা বল্ল।

বেসনভ স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো এলিজাবেথার দিকে। পরিপূর্ণ মুখে হাসি, চোখে রহস্য, কপালে ফুটেছে ঘাম। হঠাৎ বেসনভের মনে হল, সে এই স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে চায়, তার উত্তপ্ত হাতের উপর চাপ দিয়ে বল্ল, "হয় ওদের কাছে যাও,...নয়ত চল এখান থেকে।"

গাড়ীতে বসে বেসনভ বল্ল, 'পঁয়ত্রিশ বছর আমার বয়েস, কিন্তু জীবন এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। প্রেম আর আমাকে প্রতারিত করতে পারে না। জীবনের সে উন্মাদনা নেই, গতি নেই, একটা কাঠের ঘোড়া যেন, শুধু মাঝে মাঝে দোল খাচ্ছে। কিন্তু তবু সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েই আমাকে চলতে হবে দীর্ঘ দিন। একটু হেসে আবার বল্ল :—

"শেষের দিনের আশায়ইত বসে আছি। যখন গুঁড়িয়ে যাবে এই পৃথিবী,—এই কবরখানা, রক্ত রঙিন হবে আকাশ।"

সহরতলীর ছোট হোটেল। গাড়ি থামতেই ভৃত্য এসে তাদের নিয়ে গেল এক নির্জন ঘরে। ঘরের দেয়াল দাগ-ধরা লাল কাগজ মোড়া। একপাশে বিবর্ণ চাঁদোয়ার নিচে প্রশস্ত খাট, মুখহাত ধোয়ার একটা কল।

এলিজাবেথা দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো "এখানে ?"

"বেশ নিরিবিলি, না ?" বেসনভ বল্ল।

বেসনভ এলিজাবেথার গা থেকে কোট খুলে ভাংগা চেয়ারটার ওপর রাখলো। ওয়েটার ঘরে ঢুকলো। হাতে শ্যাম্পেনের বোতল, একটা ছোট টুকরীতে গোটা কয়েক আপেল্ আর এক থোলো আংগুর।

এলিজাবেথা জান্লার পর্দা সরালো। বাইরে মিটমিট করে জ্বলছে গ্যাসের আলো। অনেক গাড়ি রয়েছে পথের ধারে। এলিজাবেথা সরে এসে আয়নায় মুখ দেখলো, এলোমেলো চুল ঠিক করলো। হাসি ফুটেছে তার মুখে। তার জন্যেও আছে আগামী কাল, আজকের স্মৃতি! আজকের স্মৃতি নিয়ে সে হয়ত পাগল হয়ে যাবে।

বেসনভ জিজ্ঞেস করলো, "মদ, মদ খাবে ?"

"হাঁ।"

ডিভানে এসে সে বসেচে, নীচে তারই পায়ের কাছে বেসনভ।

'কী ভয়ংকর তোমার চোখ! নম্র, শান্ত, অথচ ভয়ংকর। রাশিয়ার মেয়ের চোখ! লিজা আমাকে ভালোবাসো তুমি ?'

বিভ্রান্ত, লজ্জিত এলিজাবেথা। সে ভাবলো, পাগলামি, নিছক পাগলামি! শ্যাম্পেনের পুরো গ্লাসটা সে এক চুমুকে নিঃশেষ করলো। মাথা ঘুরছে।

শুনলো, সে বলছে : "আমি তোমাকে ভয় করি। হয়ত, কাল আসবে অপরিসীম ঘৃণা। আমার দিকে অমনি করে তাকিওনা ; আমার লজ্জা করছে।

"অদ্ভুত, অদ্ভুত তুমি।"

"বেসনভ, তোমার কলংক কাহিনী আমি শুনেছি। আমি ধার্মিক বাপ-মার মেয়ে। সয়তানকে আমি বিশ্বাস করি। দোহাই তোমার, অমন করে তাকিওনা। আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার কাছে কী চাও?"

হাসিতে টুক্‌রো টুকরো হয়ে গেল যেন এলিজাবেথা। মদ চল্‌কে পড়লো হাতের উপর। বেসনভ তার হাঁটুর ওপর মুখ রেখেছে।

"একটু ভালোবাসো আমাকে, একটু ভালোবাসো—এই আমার প্রার্থনা।" বেসনভের স্বরে নিরাশা, একমাত্র আশা যেন তার এলিজাবেথা।

"আমি অসুখী, আমি নিঃসংগ। দয়া করবে না লিজা?"

এলিজাবেথা হাত রাখলো তার মাথার উপর, চোখ বুজে এলো তার।

বেসনভ বল্ল, প্রতিদিন রাতে মৃত্যুর ভয় তাকে পেয়ে বসে। কী অমানুষিক যন্ত্রণা। নিস্তব্ধ শয্যায় এপাশ ওপাশ করে। সান্ত্বনা দেবার তার কেউ নেই। "লিজা, তবু দয়া হবে না তোমার।"

এলিজাবেথা নিরুত্তর। ঠাণ্ডাভয়ে শিউরে উঠছে তার দেহ, উত্তেজনায় গলা এসেছে বুজে। বেসনভ চুমোয় চুমোয ভরে দিচ্ছে তার হাত, তার লম্বা সুডোল পা। অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো এলিজাবেথা।

আগুন! কে জানত রক্তে এতদিন ঘুমিয়ে ছিল আগুন! আজ বেসনভের চুমোয় চুমোয় দাউ দাউ করে জলে উঠেছে, শিরায় শিরায় তারই দাহ। এত অসুখী বেসনভ! এলিজা তার মুখ দু হাত দিয়ে তুলে ধরলো, চুমু খেল তার ঠোঁটে—লোভার্ত চুম্বন। আর লজ্জা নেই, অন্তর্বাস তার ফুলের পাপড়ির মত খসে পড়েছে, এবার সে হবে বেসনভের শয্যা-সংগিনী।

বেসনভ ঘুমিয়ে পড়েছে, এলিজাবেথার নগ্ন কাঁধের ওপর তার মাথা। এলিজাবেথা তাকালো তার দিকে। ম্লান, শীর্ণমুখ, বলিরেখা কপালে, চোখের কোলে কালি। কুশ্রীমুখ, তবুও তার জীবনের প্রথম প্রেমিক, তাকে নিয়েই তার আগামীকালের স্বপ্ন।

বেসনভের মুখের পানে তাকিয়ে কাঁদলো এলিজাবেথা। তারপর কখন এল ঘুম সে জানে না।

বেসনভ পাশ ফিরলো, সে জেগে উঠেছে। সমস্ত দেহে তার অবসাদ। আর একটা দিন শুরু হবে এবার, দীর্ঘ, একঘেয়ে দিন। দোরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। নরম কার স্পর্শ না? তাকিয়ে দেখলো, পাশে ঘুমিয়ে আছে এক নগ্নদেহা নারী, মুখ হাতে ঢাকা। কে এই নারী? মনে করতে বার বার চেষ্টা করলো। সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালো। "তাইত! একেবারে ভুলে গেছে! কে, কে এই মেয়েটি?

"জেগে আছ ?" আদর করে ডাকলো বেসনভ।

মেয়েটি নিরুত্তর, মুখ এখনো হাতে ঢাকা।

"কাল ছিলাম অপরিচিত, আজ রাত আমাদের এক করে দিয়েছে—একদেহ, এক মন" বেসনভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

মেয়েটি তবু শব্দটি করলো না। হয়ত এখুনি ককিয়ে কেঁদে উঠবে, নয়ত তীব্র অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস কাঁপিয়ে দিয়ে যাবে দেহ, নয়ত সোহাগে সোহাগে আচ্ছন্ন করে দেবে বেসনভকে। এই ত চিরাচরিত ব্যাপার। কিন্তু কই ?

বেসনভ সন্তর্পণে তার কনুই স্পর্শ করলো, ডাকলো, "মারগারিটা" !

ঐ বোধ হয় ওর নাম।

"মারগারিটা, রাগ করেছ ?"

এলিজাবেথা বিছানায় উঠে বসলো, তার ঠোঁঠ দুটি বিদ্রূপের হাসিতে ভরে গেছে। বেসনভ এবার তাকে চিনতে পারলো।

"মারগারিটা নয়, আমি এলিজাবেথা। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। দূর হও তুমি আমার সমুখ থেকে।"

বেসনভ বিড় বিড় করে বল্ল, "কতগুলো মুহূর্ত ভোলা যায় না বলেই ত জীবনে এত অশান্তি।"

এলিজাবেথা বেসনভকে দেখছিল। বেসনভ ডিভানে বসেছে, অলস আংগুলের ফাঁকে জ্বলছে সিগারেট।

এলিজাবেথা ধীরে বল্ল, "আমি বিষ খাব, মরব।"

"লিজা, কেন তুমি অমন করছ ?"

"বুঝতে পারছ না ! যাও, দূর হয়ে যাও, আমি কাপড় পরব।"

বেসনভ বাইরে এল। অনেকক্ষণ সে এদিক ওদিক পায়চারি করলো, শুনতে পেল ওয়েটার বলছে : "রাশিয়া ? রাশিয়াকে দেখতে চাও তো এস যে-কোন সহরের যে-কোন হোটেলে। প্রতি ঘরে ঘরে পুরুষ আর নারীর নির্লজ্জ বিহার। এই ত আজকের রাশিয়া।"

বেসনভ ঘরে এসে দেখলো এলিজাবেথা নেই। তার টুপিটা মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বেসনভ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, "যাক, বাঁচা গেল।" ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো।"

নতুন দিন। মেঘ কেটে গেছে। ভেজা সহরের ওপর পড়েছে সূর্যের আলো। ব্যাধির বীজাণু মুখ লুকিয়েছে বন্ধ ঘরের অন্ধকারে। আজ নেই বিষণ্নতা, নেই নিরাশা আর অবসাদ। দোকানীরা শো-কেস থেকে শীতবস্ত্র সরিয়ে ফেলেছে। সেখানে দেখা দিয়েছে বসন্তের প্রথম ফুলের মত সুন্দর পোষাক, বসন্তের পোষাক।

বিকেলের কাগজে বড় হরফে বেরুল, "দীর্ঘজীবী হোক রাশিয়ার বসন্ত।" বসন্তের স্তবের পেছনে বিপ্লবের সুর। সেন্সরের কাঁচিতে ধরা পড়েনি সে সুর।

"জীবন-যুদ্ধ সংঘের" জিরভ, শিল্পী ভ্যালিয়েট, আর সেমিসডেটভ বেরিয়েছে পথে। গায়ে তাদের লাল ফতুয়া, মাথায় লম্বা টুপি। প্রাণের প্রাচুর্যে তারা উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

পাঁচটার সময় একজন ইন্সপেক্টর ওদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল।

সমস্ত সহর বেরিয়েছে পথে। গাড়ী আর জনতা, হল্লা হুল্লোড়, নতুন একটা কিছু ঘটবেই আজ। উইন্‌টার প্রাসাদ থেকে বেরুবে হয়ত এক ইস্তাহার, সামরিক আইন জারি হবে; তারপর, আর্তনাদ, মৃত্যু; হয়ত, মন্ত্রীসভা উড়ে যাবে বিদ্রোহীদের বোমায়। এমন দিনে কিছু একটা না ঘটে যায় না।

গোধূলির ম্লান আলো ঘনিয়ে এসেছে। আলো জ্বলে উঠলো, নেভার ডকের চিমনির পেছনে এখনও পড়ন্ত সূর্যের লাল ইংগিত। পেট্রোপ্যাভলভ্‌স্ক দুর্গের চূড়ায় শেষ আভা তার কেঁপে উঠলো, এবার দিন শেষ। এখনো কিছু ঘটেনি।

বেসনভ অনেক লিখেছে। এবার সে কলম ফেলে দিয়ে পড়তে বসলো গ্যয়টে। গ্যযটে তাকে উত্তেজিত করে, অণুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

বেসনভ আবার লিখতে বসলো। রাশিয়ার ওপর এসেচে রাত্রির আঁধার ঘনিযে। বিয়োগান্ত অভিনয়ের যবনিকা অপস্যমান। আঁধার মঞ্চ, তার মুক্তি নেই, রাশিয়ার মুক্তি নেই!

বেসনভ চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করলো। সুদূর প্রসারী মাঠ, বিক্ত মাঠ, বাতাস তার রিক্ততার ওপর দিয়ে হুহু করে বয়ে যায়, দূরে পাহাড়ের ওপর আগুন। এই রিক্ত ভূমিকেই সে ভালোবাসে, এই তার রাশিয়া। বেসনভ একটা সিগারেট ধরালো।

...আর লেখা হবে না। দীর্ঘ অফুরন্ত রাত সামনে। কেউ তাকে ফোন করেনি, কেউ তার সংগে দেখা করতে আসে নি। কি করে রাত কাটাবে? হয় ত, অদৃশ্য শত্রুর সংগে যুদ্ধ করেই কাটাতে হবে, এখনি ত সে পাচ্ছে তার ছোঁয়া। তারপর যখন আলো নিভবে, রাত গভীর হবে, কামুক মেয়ের মত সে তাকে জড়িয়ে ধরবে, আচ্ছন্ন করে দেবে তার বিষাক্ত আলিঙ্গনে।

—"আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।" কোনো মেয়ের স্বর। হালকা পায়ের শব্দ তার দরজার কাছে এসে থেমে গেল। বেসনভ নড়ল না; একটু হাসলো। নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল, ঢুকলো একটি মেয়ে।

"কে, ডারিয়া দিমিট্রিভ্‌না?"—বেসনভ উঠে দাঁড়ালো।

"হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"—ডাশার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা পরিস্ফুট।

"কি করতে পারি আপনার জন্যে ?" বেসনভ নীল টেবল-ল্যাম্পটা জ্বাললো। মুখে তার স্বচ্ছ ম্লানিমা, চোখের পাতায় নীলাভ ছায়া। আগন্তুকের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে চিনতে পারলো।

"কে, ডারিয়া দিমিট্রিভ্না ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।"

ডাশা চেয়ারে বসেছে, হাঁটুর উপর এসে পড়েছে তার দস্তানা-মোড়া হাত দুটি।

"এ আমার পক্ষে মস্তবড় সৌভাগ্য যে আপনি আজ এসেছেন।"

"আমাকে আপনার ভক্ত বলে মনেও করবেন না। আপনার কবিতা আমার ভালো লাগে না। কেমন ক্লেদাক্ত, দুর্বোধ্য যেন !"

ডাশা তীক্ষ্ণস্বরে বল্ল, "আর কবিতার প্রশংসা করতে আমি এখানে আসিনি। ··· আমি এসেছি ··· না এসে আমি পারলুম না।"

ডাশা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বেসানভ স্পষ্ট দেখতে পেল একটা রোগার্ত লাল জ্বালায় ওর মুখখানা ছেয়ে গেছে। বেসনভ কিছু বলতে পারলনা।

"জানি, আমার আসা, না-আসায় আপনার কিছু যায় আসে না। তবু আমাকে আসতে হল। আপনাকে সব খুলে না বলে নিষ্কৃতি নেই। বুঝতে পারছেন ত, আমি আপনাকে ভালোবেসেছি।"

ঠোঁঠ তার কেঁপে উঠলো। দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালো সে।

দেয়ালে মহিমময় পিটারের মূর্তি, চোখ বোজা, মুখ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। কানে আসছে গানের সুর "মরব আমরা" "না, না উড়ে যাব" ··· "অনন্ত আকাশে ··· অপার আনন্দে।"

"না, না, আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাই না, বিনিয়ে-বিনিয়ে ভালোবাসার কথা। আমি তাহ'লে এখুনি বিদায় নেব। যে মেয়ে উপযাচিকা হয়ে এসেছে, তার প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকতে পারে না। আমি আপনার কাছে কিছু প্রত্যাশা করিনি। শুধু জানাতে এসেছি আমার প্রেম, প্রেম ত নয় সে আমার অপমান, আমার লজ্জা।"

মনে মনে সে ভাবলো, 'এবার নমস্কার ও বিদায় !' কিন্তু বসে বসে সে দেখতে লাগলো পিটারের মুখ। তার ওঠবার শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে, দেহে এসেছে পংগুতা।

বেসনভ নিজের মুখে হাত ঢেকে অস্ফুট স্বরে বল্ল, "ঠিক গীর্জেয় অমনি করে ধর্ম-যাজক প্রার্থনা করে।"

"নিঃসংগ জীবনের অনন্ত রাতের বুকে একটু সুগন্ধ বয়ে এনেছেন আপনি। আত্মা ভরে গেল ! এদিন আমি ত কখনো ভুলব না।"

"আপনাকে কেউ মনে রাখতে বলেনি।" ডাশা দাঁতে দাঁত ঘষলো।

বেসনভ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বুক-কেসে হেলান দিয়ে বল্ল :

"জানি, আমি আপনার প্রেমের উপযুক্ত নই। এই মুহূর্তে জীবনের উপর সবচেয়ে বেশি ঘৃণা হচ্ছে। কি করেছি আমি জীবন নিয়ে? ছিনিমিনি খেলেছি, ফোঁত হয়ে গেছি। আজ আমি নিঃস্ব, রিক্ত। ভাবিয়া, কয়েক বছর আগে এলে না কেন? তখনো ছিল জীবনের পানপাত্র পূর্ণ, তখন আমি তোমাকে ছাড়তুম না, ছাড়তুম না।'

ভাশার মনে হল হাজার ছুঁচ্ তাকে বিঁধছে।

"পানপাত্র থেকে পানীয় চল্‌কে পড়ে গেছে, জীবনের রক্তমদিরা। তুমিই বুঝবে, একমাত্র তুমিই বুঝবে সে জ্বালা। আকণ্ঠ পিপাসায় আর্ত হয়ে হাত বাড়ালাম, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো পানীয়, ভিজলো না গলা।'

"না, আমি বুঝতে চাই না।" ভাশার গলা বুজে এল।

"বুঝতে হবে, তোমাকেই ত বুঝতে হবে। তুমিও ত এসেছ পূর্ণপাত্র হাতে আমারই কাছে। আমি পারি, ভেংগে ফেলতে পারি।"

ভাশা শিউরে উঠলো।

"ভয় পেয়েছ? না, না ভয় পেওনা। তোমার সুন্দর চোখে ভয়ের কালো ছায়া দেখতে আমার ভালো লাগবে না। তুমি তোমার দিদির মতই সুন্দর।'

'কি," ভাশা চিৎকার করে উঠলো, "কি বলছেন আপনি?"

চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো। বেসনভের মুখোমুখি। সুগন্ধে বেসনভের নাসারন্ধ্র ভরে গেছে, এসেন্স না ভাশার চামড়ার গন্ধ। বেসনভের মগজের কারখানায় আলোড়ন শুরু হয়েছে, জাগছে এক নারীমেদ লোভাতুর মানুষ। সে ভাশার হাত ধরলো। ভাশা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বেসনভ শুনতে পেল সদর দরজা বন্ধের শব্দ।

চেয়ারে সে বসে পড়েছে। অন্ধকারের ঢল নেমে এসেছে চারদিকে, নীল আলোটা ঢেকে গেল বলে অন্ধকারের কালো চুলে। অদৃশ্য শত্রুদের কুৎসিত ভ্রূণ বাড়ছে—অন্ধকারের অন্তরালে এইবার শুরু হবে তাদের আক্রমণ। না, না বেসনভের নিষ্কৃতি নেই তাদের হাত থেকে।

সাত

"কে, ভাশা? এস।"

ভাশা ঘরে ঢুকে দেখল, কাটিয়া প্রসাধনে ব্যস্ত।

কর্সেটটা দেখিয়ে বল্ল, "নতুন কর্সেট দেখেছ ভাশা? পেটের ওপরে চাপ পড়ে না।"

ভাশা কথা বল্ল না।

"ওঃ পছন্দ হল না বুঝি ?"

"আয়নায় ও মুখ না দেখলেই ভালো হয়।" ডাশা বল্ল।

"বারে! আয়নায় মুখ দেখবো না! বুড়ি ত হইনি!" খিল খিল করে হেসে উঠলো কাটিয়া।

"কার জন্যে এত সাজগোজ করছ ?"

"কার জন্যে আবার!"

"মিছে বলতে জিভে বাধে না ?"

কাটিয়া অবাক হয়ে ডাশার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"যাও, নিকোলাইকে সব কথা খুলে বল।"

কাটিয়া গলায় একটা স্ফীতি অনুভব করলো।

"আমি এই মাত্র বেসনভের ওখান থেকে ফিরছি।"

কাটিয়া শাদা হয়ে গেল, প্রসাধনের অন্তরাল থেকে ফুটে উঠলো ম্লানিমা।

"না, না, আমার জন্যে তোমার ভয় নেই। আমি অক্ষত ফিরে এসেছি।" ডাশার স্বরে বিদ্রূপ।

"আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। যাও, নিকোলাইকে বলে এস।"

"এখুনি যাব ?" কাটিয়ার মাথা নুয়ে পড়েছে।"

"হাঁ, এখুনি।"

"না, আমি পারব না," দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো।

ডাশা নিরুত্তর।

"বলব, হাঁ তাকে সব কথাই খুলে বলব ডাশা।" কাটিয়ার স্বর কেঁপে উঠলো।

নিকোলাই ড্রয়িং রুমে বসে সদ্য-আগত মাসিকপত্র পড়ছিল। কাটিয়া ঢুকতেই বল্ল, "বাকুনিনের মৃত্যুর উপরে আকুনদিন কি লিখেছে শোন:

"বাকুনিনের বিশেষত্ব তাঁর মতবাদের মধ্যে লুকিয়ে নেই, আছে তাঁর কাজের মধ্যে। দিনের পর দিন প্রুধোঁর সংগে তাঁর সাক্ষাৎকার, বিনিদ্র রজনী চিন্তায় যাপন, সংঘর্ষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পডা, মতবাদকে কর্মে রূপান্তর—এই ত বাকুনিনের সত্যিকারের পরিচয়। কল্পনার মার্গে তিনি কখনও বিচরণ করেন নি—জড়জগতের কর্মপ্রবাহে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁরই ভেতরে আমরা দেখেছি কল্পনা আর জড়জগতের অপূর্ব সমন্বয়, মহা মিলন।"

"সত্যি কথা কাটুসা ··· শুধু বিপ্লবের বুলি আউড়ে কি হবে? আমাদের চার-পাশে রয়েছে নগ্ন, রূঢ় বাস্তব, কল্পনার সেখানে স্থান নেই। রাজশক্তি নিষ্ঠুর হতে নিষ্ঠুরতর পথে চলেছে। ওদিকে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্ফীত হয়ে উঠেছে প্রখর কল্পনায়, উন্মত্ত হয়ে উঠেছে উচ্ছৃঙ্খলতায়। গুমোট হয়ে উঠেছে

আবহাওয়া। চাই প্রাণ, চাই বিশুদ্ধ হাওয়া—জোর গলায় আমরা চিৎকার করছি। কে আনবে সে মৃতসঞ্জীবনী? রাশিয়া পচছে, গলছে, সিফিলিস আর ভডকার স্রোতে ...”

নিকোলাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কাটিয়া তার চুলের ওপর হাত বুলোতে-বুলোতে বললো: “তুমি আঘাত পাবে জানি, কিন্তু তবু আমাকে বলতে হবে।”

“বল, আমি শুনছি কাটিয়া।” তখনো তার উত্তেজনা থিতিয়ে যায়নি, স্বরে কম্পন।

“তোমার মনে আছে, একদিন আমি বলেছিলাম ...?” নিকোলাই ফিরে তাকালো কাটিয়ার দিকে।

“মনে আছে, আমি তোমার অভিযোগ অস্বীকার করেছিলাম ... কিন্তু আমি, আমি অবিশ্বাসিনী ...”

“কাটিয়া!” নিকোলাইর গলা শুকিয়ে গেছে। কাটিয়া নিকোলাইর হাতখানা তুলে নিয়ে চেপে ধরলো বুকে, তারপর লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

কয়েক মিনিটের ছেদ। নিকোলাইর স্বর শোনা গেল: “তুমি যেতে পার।”

কাটিয়া উঠে বাইরে চলে এল।

ডাশা ঝাঁপিয়ে ওর বুকের উপর পড়ে বল্ল, “ক্ষমা কর কাটিয়া, আমায় ক্ষমা কর।”

“তোমার অনুরোধ আমি রেখেছি ডাশা।” কাটিয়া শুনলো সে বলছে।

“আমায় ক্ষমা কর।”

“না ডাশা, তুমি ঠিকই বলেছিলে।”

“না, না, ঠিক বলিনি। আমায় ক্ষমা কর।”

“যাক্ সব চুকে গেল!” কাটিয়া আপন মনে বল্ল। “নিকোলাইর কাছ থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছিলাম, তবু ছিল মিথ্যার বাঁধন। আজ আর তাও নেই! কতদিন ভেবেছি ওকে আবার ভালোবাসব, নতুন করে পাতব সংসার। বেসনভকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। কিন্তু কী ফল হল?”

কাটিয়া পেছন ফিরে দেখলো, কখন নিকোলাই এসে দাঁড়িয়েছে।

“বেসনভ?” নিকোলাই মৃদু হাসলো।

কাটিয়া নীরব। মুখের ওপর তার অসুস্থ রক্তের চাপ।

“চল, তোমার সংগে এখনও অনেক কথা বাকি।—ডাশা, তুমি ওঘরে যাও।”

“না, আমি যাব না।”

নিকোলাইর মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়লো রক্তিম আভা, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। শান্ত স্বরে বল্ল:

"আচ্ছা, তুমি থাক। কাটিয়া, এতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম, কি করা যায় তোমাকে নিয়ে। সহজ একটা সমাধান করে ফেললাম আমি তোমাকে খুন করব, হাঁ খুন--খুন!"

ডাশা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো কাটিয়াকে। কাটিয়ার ঠোঁট দুটো কুঁচকে উঠলো ঘৃণায়ঃ

"হিষ্টিরিয়া।"

"না হিষ্টিরিয়া নয়, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, ও ছাড়া উপায় নেই।"

"কর, খুন কর!" চিৎকার করে ডাশাকে টেনে ফেলে কাটিয়া এগিয়ে গেল। "কর, খুন কর। আমি তোমাকে ভালোবাসি না, ঘৃণা করি।"

নিকোলাই পকেট থেকে পিস্তল বার করলো, নলটা কাটিয়ার দিকে ফেরানো। প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে, মুহূর্ত গুলি। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

"কাটুসা, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।" ডাশা বল্ল।

"না, আমি এমন করে বাচতে চাই না ডাশা। আমি চলে যাব।" দু'হাতে মুখ ঢেকে কাটিয়া কেঁদে উঠলো।

নিকোলাই আর কাটিয়া সন্ধ্যেবেলা অনেকক্ষণ স্টাডির দোর বন্ধ করে কথা বল্ল, কিন্তু কোনো ফলই হল না।

নিকোলাই সারারাত জেগে স্ত্রীকে চিঠি লিখলোঃ

"নৈতিক অধঃপতন এসেছে যুগের—শুধু তোমার আমার নয়। আজ পাঁচ বছর ধরে কোনো অনুভূতির সাড়া পাই না আমার মনে। মনে হয় আমাদের ভালোবাসা, বিবাহ, সব নিরর্থক হয়ে গেছে। জীবন সংকীর্ণ, অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ... স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। দুটি উপায় এখন আছে--এক মৃত্যু, আর এক মনের এই আঁধার পর্দাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা। কোনটাই আমাকে দিয়ে হল না ..."

দিন আবার একঘেয়ে স্রোতে বয়ে চলেছে। নিকোলাই এক প্রণয়ী খুনের মামলা নিয়ে ব্যস্ত। অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে, খাওয়া-দাওয়া বাইরেই সেরে আসে। কাটিয়া যাবে দক্ষিণ ফ্রান্সে, তার জিনিসপত্র গোছানো সারা। বারো হাজার রুবল নিকোলাই তাকে দিয়েছে। ওদিকে নিকোলাই মোকদ্দমার হাংগামা চুকলে একবার ক্রিমিয়া থেকে ঘুরে আসবে। ডাশা? ডাশা কোথাও যাবে না। আইন পরীক্ষা তার এসে গেছে। পরীক্ষা শেষ হলে সামারায় যাবে বাবার কাছে।

আট

মে মাসের শেষে ডাশার পরীক্ষা হয়ে গেল। সে যাত্রা করলো সামারায়। রিবিনস্ক হয়ে ভলগা দিয়ে সে যাবে। একদিন সন্ধ্যায় সে শাদা ষ্টীমারটিতে চড়ে বসলো।

বেশ ছোট্ট, ঝক্‌ঝকে তকৃতকে কেবিনটি। ডাশা কেবিনে ঢুকে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলো, চুল আঁচড়াল, তারপর শুয়ে পড়লো বিছানায়। পোর্টহোল দিয়ে আসছে সমুদ্রের হাওয়া, ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে। একটু ষ্টীমারখানা দুলছে। ডাশা ঘুমিয়ে পড়লো।

অনেক পায়ের শব্দ ডেকের ওপর। লোকজনের গোলমালে সে যখন জেগে উঠ্‌লো, তখন বেশ বেলা হয়েছে। জান্‌লা দিয়ে দেখলো ষ্টীমার এসে ভিড়েছে পাড়ে। লোকজন ওঠানামা করছে। ডাশা উঠে মুখ ধুল, পোষাক পরলো, তারপর বেরিয়ে এল ডেকের উপর। সূর্যের তরল আলো এসে পড়েছে ষ্টীমারের উপর। জল যেন জ্বলছে। দূরে ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে দেখা যায় মন্দিরের চূড়া।

ষ্টীমার ছেড়েছে। মাঠ, বন, পাহাড় দূরে ফেলে রেখে চলেছে, মাঝে মাঝে বসতবাড়ী দেখা যাচ্ছে। আকাশে মেঘ, ছায়া পড়েছে জলে, ভেঙে যাচ্ছে চাকার আঘাতে।

ডাশা একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। কে এসে রেলিঙের পাশে দাঁড়ালো, ওকে দেখছে। ডাশা ফিরে তাকালো না। নদীর হাওয়ায় উন্মনা হয়ে উঠেছে। এখনো বোধ হয় লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। ডাশা এবার ফিরে তাকালো।

তেলেগিণ।

"আমি আপনাকে কাল রাতেই দেখেছিলাম।"—তেলেগিণ কাছে এসে বল্ল। "আমিও ঐ এক ট্রেণেই পিটার্সবুর্গ থেকে এলাম।"

ডাশা একটা চেয়ার টেনে এনে বল্ল, "বসুন না, আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, আপনি?"

"জানি না কোথায় যাব। তবে আপাতত দেশে।" তেলেগিণ বল্ল।

চাকায় বেঁধে কল কল করে উঠছে নদী, অযুত ফেনার শাদা ফুল দিগ্বিদিকে ছুটে চলেছে। ষ্টীমারের পেছনে বোলতার ঝাঁকের মত উড়ছে মার্টিন পাখীর দল।

"চমৎকার দিন, ডারিয়া দিমিট্রিভনা!"

"চমৎকার। বসে বসে মনে হচ্ছিল, নরক থেকে যেন পালিয়ে এলাম। পথে সেই দেখা, মনে আছে?"

"হাঁ।"

"উঃ কী কাণ্ড হল তারপর! সব খুলে বলব এক সময়, পিটার্সবুর্গে একমাত্র আপনাকেই দেখলাম সত্যিকারের মানুষ!"

তেলেগিণ অবাক হয়ে গেল!

"হাঁ, আপনার উপরেই একমাত্র নির্ভর করা যায়।" ডাশার উজ্জ্বল অনুভূতি কথা হয়ে ঝরে পড়লো।—"আমার মনে হয়, আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন, সে ভালোবাসায় থাকবে সাহস, নম্রতা, নির্ভরশীলতা।"

তেলেগিণ কোনো কথা বল্ল না। পকেট থেকে রুটি বার করে টুক্‌রো টুক্‌রো করে পাখীদের ছড়িয়ে দিল।

"ঐ, ঐ যে সব শেষের পাখীটা," ডাশা চটুল স্বরে বল্ল, "ও পায়নি!"

তেলেগিণ ছুঁড়ে দিল শেষ টুক্‌রোটা। ডাশা বল্ল:

"আসুন, এবার প্রাতরাশ শেষ করা যাক।"

তেলেগিণ খাদ্য-তালিকা হাতে নিয়ে বল্ল, "একটু মদ নেয়া যাক, কি বলেন? লাল না শাদা?"

"যেটা হোক আপত্তি নেই।"

ওদের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে সবুজ শস্যের ক্ষেত, পাহাড়, বন, কৃষকের ছোট কুঁড়ে ঘর। একটা কারখানা, একটা গম-পেষা কলবাড়ি—দূর থেকে মনে হয় ছোট খেলনা।

গরম হাওয়া এসে শাদা টেবিল ঢাকনিটা আর ডাশার ফ্রকটা দুলিয়ে দিয়ে গেল। সোনার রঙের মদ গেলাসের ভেতর নড়ছে। ডাশা তাকালো তেলেগিণের দিকে।

"আপনাকে দেখে আমার হিংসে হয়। নিজের কাজ করে চলেছেন, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই," ডাশা বল্ল।

"কিন্তু কাজ থেকে ত আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে," তেলেগিণ হাসলো।

"সত্যি?"

"নইলে কি আর এই ষ্টীমারে দেখতে পেতেন। কেন, কারখানার ব্যাপার আপনি শোনেন নি?"

"শুনিনি ত!"

"রাশিয়া সমৃদ্ধ, রাশিয়ার প্রতিভা আছে বহুদিন ধরেই ত শুনে আসছি। কিন্তু কী আছে আমাদের? শুধু কালি আর কলম, জীবন নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে ক'দিন চলতে পারে?"

তেলেগিণ গ্লাস সরিয়ে রেখে সিগারেট ধরালো। কারখানার ব্যাপার তার বলবার ইচ্ছে নেই।

"থাক্—কি হবে ওকথা বলে?"

সমস্ত দিনটা ওরা ডেকের উপর কাটালো। কথা আর ফুরোয় না। ডাশা মাঝে মাঝে চেষ্টা করছিল বেসনভের প্রসংগ উত্থাপন করতে। কিন্তু বেসনভ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অফুরন্ত সূর্যের আলোয়, নদীর হাওয়ায়। আজকের দিনটা ডাশা আর তেলেগিণের। বেসনভের প্রয়োজন নেই। ডাশা ভাবলো, আজ থাক্, কাল যখন বৃষ্টি নামবে, তখন বলব।"

ষ্টীমারে ঘুরে ঘুরে ডাশা প্রতিটি যাত্রীকে দেখলো। তারপর শুরু হল তার মন্তব্য। পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরকে দেখিয়ে বল্ল, সে তাসের জুয়াড়ী। তেলেগিণ তাঁকে রেক্টর বলেই জানত, তবু কেমন যেন একটা সন্দেহ হল, হবেও বা। তার মনে হল, সে যেন দিবাস্বপ্নের মাঝে গা ডুবিয়ে দিয়েছে। বাস্তব সরে যাচ্ছে দূরে। ডাশা নদীতে পড়ে গেলে, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বুকে করে তুলে আনতে পারে। শুধু ও একবার যদি পড়ে যায়!

রাত একটার সময় ঘুমন্ত চোখে ডাশা বিদায় নিল: "বিদায়, জুয়াড়ীর পাল্লায় পড়বেন না, বন্ধু!"

প্রথম শ্রেণীর সেলুনে রেক্টর বসে ডুমার বই পড়ছেন। তেলেগিণ তাঁকে দেখলো অনেকক্ষণ ধরে। জুয়াড়ী হলেও সম্ভ্রান্ত তার চেহারা। তারপর আলোকিত করিডোর দিয়ে সে চললো নিজের কেবিনের দিকে। ডাশার স্নিগ্ধ সুগন্ধি ছড়ানো, চারদিকে পালিশের গন্ধ, ইঞ্জিনের শব্দ। জীবন বদলে যাচ্ছে, যাচ্ছে নাকি?

ষ্টীমারের সাইরেন সাতটায় তার ঘুম ভাংগিয়ে দিলে। কিনেশিমায় পৌঁছেছে তারা। তেলেগিণ পোষাক পরে বেরিয়ে এল। চারদিক নিঝুম, ডাশার কেবিনের দোর বন্ধ।

কিনেশিমার কাঠের বাড়িগুলো প্রথম সূর্যের আলোয় ঝিমুচ্ছে, এইখানে সে নামবে, নইলে কি হবে সে জানে না। একটা কুলি তার পাটকিলে রং-এর ট্রাংক নিয়ে এল।

"না, না, আমি এখানে নামব না। নিজনিতেই নামব। ট্রাংকটা আমার কেবিনে নিয়ে যাও।" তেলেগিণের স্বরে চঞ্চলতা।

তিন ঘণ্টা ধরে কেবিনে বসে সে ভাবলো, ডাশাকে কি বলবে?

এগারোটার সময় সে ডেকের উপর ডাশাকে খুঁজলো। কোথায় ডাশা? অসুখ করেনি ত তার? না, না, ঐ ত বসে আছে সেই কালকের চেয়ারটিতে! ডাশা তাকালো তেলেগিণের দিকে। রক্তিমতার ভিড় গালে, চোখে আনন্দ।

"আপনি নামেন নি?"

"নামতুম, কিন্তু নামা হল না।" তেলেগিণ দ্বিধা জড়িত স্বরে বল্ল, "আপনি কি ভাবছেন জানি না।"

"কি ভাবছি, নাই বা শুনলেন।" ডাশা হেসে উঠলো, তার হাত কখন গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তেলেগিণের হাতে!

নয়

কারখানার ছুটি হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টি পড়ছে, তবু শ্রমিকরা চলেছে বাড়ি। এমন সময় তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালো একটি অপরিচিত মানুষ। বর্ষাতির কলারটা মুখ পর্যন্ত তোলা, হাতে এক গাদা কাগজ। তাদের সংগে সংগে সে এগিয়ে চললো। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে কাগজ বিলি করতে লাগলো।

"পড়ে দেখ।"

শ্রমিকরা কাগজ নিয়ে পকেটে বা টুপির মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। কারখানায় কয়েক সপ্তাহ ধরে নতুন লোকের দল আসছে। কারখানার প্রতি ছিদ্র দিয়ে যেন আমদানি হচ্ছে ইস্তাহার, একই বুলি :

"তোমরা যদি মানুষ হতে চাও, তোমাদের প্রভুদের ঘৃণা কর।"

শ্রমিকরা বুঝতে পারলো, জারের শাসন তাদের বারো ঘণ্টা খাটাচ্ছে, নগরের সমৃদ্ধ জীবন থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। তারা পড়ে আছে সহরের আবর্জ্জনায়। সেখানে খাদ্যাভাব, নোংরামি, তিলে তিলে মৃত্যু। তাদের মেয়েরা হয়েছে পসারিণী, ছেলেরা চলেছে ধনিকের চাকার তলায় জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিতে। ইস্তাহার লিখেছে :

"তাদের কাছ থেকে তোমাদের অধিকার কেড়ে নিতে হবে, বিদ্রোহ করতে হবে। ঘৃণা তোমাদের একমাত্র ধর্ম। তারা তোমাদের শিখিয়েছে : ধৈর্য ধর, ক্ষমাশীল হও,—ভণ্ডামী, স্রেফ ভণ্ডামী! ঘৃণা কর তাদের, সম্মিলিত হও তোমরা! তারা শিখিয়েছে : প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, কিন্তু প্রতিবেশীরা তোমাদের ঘাড়ের ওপর তুলে দিয়েছে দাসত্বের জোয়াল। ওদের চাটু কথায় ভুলো না তোমরা। গড়ে তোল নতুন রাশিয়া, তোমরাই হবে তার সর্বময় প্রভু।"

বর্ষাতি-পরা লোকটির ইস্তাহার বিলি যখন শেষ হয়ে গেছে, ভিড়ের মধ্য থেকে একটি পুলিশ বেরিয়ে এসে তাকে ধরলো। পুলিশের হাত ছাড়িয়ে লোকটা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। তীব্র হুইসল শোনা গেল, দূর থেকে আর একটা প্রতিধ্বনি। বর্ষাতি-পরা লোকটার খোঁজ পাওয়া গেল না।

দুদিন পরে কারখানার ম্যানেজার সকালে এসে দেখলেন, শ্রমিকরা কাজ শুরু করেনি। তাদের দাবী মেটাতে হবে, তবে ত কাজ! সমস্ত কারখানায় একটা চাপা উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেছে। লেদের কাছে কাছে শ্রমিকরা জটলা করছে, অফিসে শোনা যাচ্ছে ম্যানেজারের হুংকার।

হাইড্রলিক প্রেসের সামনে ফোরম্যান পাভলভ কি করছিল, একখণ্ড উত্তপ্ত সিসে এসে পড়লো তার পায়ে। সে চিৎকার করে উঠলো। সারা কারখানায় গুজব রটে গেল,

একজন খুন হয়েছে। নটার সময় প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের গাড়ি এসে থামলো কারখানার উঠোনে।

তেলেগিণ ঠিক সময়েই অফিসে এসেছে। প্রধান ফোরম্যান পাংকোর সংগে কি একটা কাজের কথা বলছিল। ওদিকে কাজ চলছে। শব্দ করছে যন্ত্রদানব, গলিত লাভার মত ধাতুর নিস্রাব গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে।

দরজা সশব্দে খুলে গেল, একজন অল্পবয়স্ক শ্রমিক ঢুকে তেলেগিণের দিকে আড চোখে তাকিয়ে বল্ল, "কাজ বন্ধ কর শুনছ ?"

"শুনেছি, চিৎকার কোরো না।" ওরেশনিকভ শান্তভাবে বল্ল।

"তোমাদের কাজ বন্ধ করতে বলা হল! শোনা না-শোনা তোমাদের ইচ্ছে।" শ্রমিকটি চলে গেল।

"কাজ বন্ধ করবে? খাবে কি শুনি! ছোকরাদের মাথায় কি সে কথা ঢুকেছে?"

"কাজ এখন রেখে দাও—ভ্যাসিলি।" ওরেশনিকভ বল্ল।

তেলেগিণ জিজ্ঞেস করলো, "কি ব্যাপার?"

পাংকো বল্ল:

"টার্নাররা ধর্মঘট করেছে। কাজ বেড়েছে, ওভার-টাইম খাটতে হয়। অথচ মজুরী বাড়েনি। ওরা ওদের দাবী ছয় নম্বর দালানের সামনে লটকে দিয়েছে। তেলেগিণ হাত দুটো পেছনে রেখে ফানেসগুলোর পাশে ঘুরতে লাগলো।"

"ওরেশনিকভ, ব্রোঞ্জের টুকরোটা তুলে নেবার সময় হয়নি?"

ওরেশনিকভ উত্তর দিল না। জামা আর টুপিটা হাতে নিয়ে সে চিৎকার করে বল্ল: "ভাই সব, কাজ বন্ধ করে ছয় নম্বর বাড়িতে চল।"

সে দরজার কাছে গেল। শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে।

দুপুরের মধ্যেই সমস্ত কারখানা ধর্মঘট করলো। গুজব শোনা গেল, অবুকভ ও নেভস্কি পাড়ার কারখানাগুলোতেও ধর্মঘট হয়েছে। কারখানার উঠোনে শ্রমিকরা জমায়েত হয়েছে। তারা ধর্মঘট সমিতি এবং ম্যানেজারের সংগে কথাবার্তার ফলাফল জেনে বাড়ি ফিরবে।

অফিসে বসেছে সভা। ম্যানেজার একরকম রাজি—শুধু পূবের দরজাটা শ্রমিকদের ব্যবহার করতে দিতে নারাজ। ঐ দরজাটা খুলে শ্রমিকদের কারখানায় ঢুকতে আধমাইলটাক হাঁটতে হয় না। ধর্মঘট সমিতি ম্যানেজারকে সে কথা বল্ল। তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। মিলের সম্মান রাখতে হলে ওটা নাকি শ্রমিকদের ব্যবহার করতে দেয়া চলে না। এমন সময় মন্ত্রীসভা থেকে এই মর্মে ফোন এল, মজুরদের কোনো দাবীই মেটানো হবে না। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কর্তাদের কাছে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানাতে ছুটলেন। শ্রমিকরা বিভ্রান্ত হল। এতক্ষণ তারা জানত, তাদের

দাবী মিটবে, তারা তাই হাসি গল্পে মেতে সময় কাটাচ্ছিল, কিন্তু এবার? নিষ্পত্তি এখনো বহু দূরে।

তেলেগিণ সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত কারখানায় থেকে বাড়ী ফিরলো।

পরদিন কারখানার কাছে এসে সে দেখলো ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়। পথে শ্রমিকরা দাঁড়িয়ে কথা বলছে, ফটকের কাছে জমেছে বিশাল জনতা। তেলেগিণ জানা লোকের কাছে নানা কথা শুনলো। ধর্মঘট-সভার সবাইকে কাল রাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; শ্রমিকদের মধ্যে ধরপাকড় চলছে। আর একটা ধর্মঘট-সভা গড়ে গোপনে কাজ চালানো হচ্ছে। আবার শোনা গেল: রাজনীতির গন্ধ পেয়ে কারখানার কর্তৃপক্ষ নাকি কসাক সৈন্য আমদানি করেছেন। ভিড় ভাঙবার হুকুম ওরা নাকি পালন করেনি—এমনি নানা কথা!

তেলেগিণের কাছে সব কথাই অসম্ভব ঠেকলো। ভিড়ের ভেতর দিয়ে বহু কষ্টে ফটকের কাছে এসে পৌছুল। অফিসে গিয়ে সঠিক সংবাদ নেবে।

"কোথায় যাচ্ছ?" ফটকের কসাক প্রহরী বল্ল।

"আমি এখানকার একজন ইঞ্জিনিয়ার, ভেতরে যেতে চাই।"

"এই হট্ যাও।"

জনতার ভেতর থেকে চিৎকার উঠলো: "জারের পোষা কুকুর, আমাদের অনেক রক্ত তোদের দাঁতে এখনো লেগে আছে।"

একটি অল্প বয়সী ছেলে প্রহরীর কাছে এসে বল্ল:

"ভাই কসাক, আমরা সবাই ত রুশ? তবে কার বিরুদ্ধে তুমি তুলতে যাচ্ছ তোমার অস্ত্র? নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে? আমরা কি তোমাদের শত্রু, ভাই, যে গুলি করে মারবে?"

একজন কসাক সৈনিক ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ফটকের ভেতরে ঢুকে গেল। আর একজন বল্ল:

"গোলমাল কোরো না, সরে যাও।"

তেলেগিণ ইতিমধ্যে ফটক থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে ভিড়ের চাপে। সেই জনসমুদ্রের দিকে সে তাকালো। ঐ যে ওরেশনিকভ বেড়ার উপর নিশ্চিন্ত মনে বসে রুটি চিবুচ্ছে! তেলেগিণ কাছে যেতেই বল্ল, "ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

"কি হবে শেষ পর্যন্ত?"

"কি আবার হবে? চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে আমরা চুপ করে যাব, তারপর আবার কারখানার কাজ। ওরা কসাক এনেছে। কসাকদের সংগে কি দিয়ে যুদ্ধ করব? রুটি আর পেঁয়াজের টুকরো দিয়ে?"

জনতার ভেতর একটা গুঞ্জন শোনা গেল, তারপর সব নীরব।

আদেশের স্বরে কে যেন বলছে :

"তোমরা বাড়ি যাও, তোমাদের দাবী বিবেচনা করা হবে।"

"আর একবার ওরা ভদ্রভাবে বলবে।"—ওরেশনিকভ বল্ল।

"কে ?"

"চেন না, কসাক সেনাদলের ক্যাপটেইন।"

জনতা দেখতে-দেখতে পাতলা হয়ে এল। সবাই ফিরে চলেছে।

"না, না, ভাই সব যেও না!" তেলেগিণ দেখলো সেই অল্প বয়েসী ছেলেটি চিৎকার করে বলছে। "যেও না, যেও না। কসাকরা আমাদের উপর গুলি চালাবে না। ওদিকে রেলের মজুররা ধর্মঘট করেছে। গভর্নমেণ্ট ভয় পেয়েছে। দাঁড়াও, ফিরে দাঁড়াও!"

জন-তরংগ ফিরে দাঁড়ালো। তেলেগিণ তাকিয়ে দেখলো, ওরেশনিকভ কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। গোলমাল, হৈ-চৈ চারদিকে কানে ভেসে আসছে; মাঝে মাঝে 'বিপ্লব, বিপ্লব!'

তেলেগিণ পেছন ফিরে আকুনদিনকে দেখতে পেল। আকুনদিন দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে।

"চল, চল, তোমাকে ছাড়া কোনো মীমাংসা হবে না।"

"আমার ঐ এক কথা—এই কসাক সৈন্যেরা চলে যাক।" আকুনদিনের স্বরে অনমনীয় দৃঢ়তা।

"তুমি পাগল। এখুনি ওরা গুলি চালাবে।"

"তোমরা মীমাংসা কর, আমি ওর ভেতরে থাকতে চাইনা।"

"পাগলামি, এ নিছক পাগলামি," লোকটা বিড় বিড় করতে করতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। আকুনদিন একজন শ্রমিককে ডেকে কি বল্ল, সে মাথা নেড়ে চলে গেল। তারপর আর একজনকে, তেমনি মাথা নাড়া। আকুনদিন বোধ হয় কোন পরামর্শ দিচ্ছে। ফটকের কাছে এবার রীতিমত গোলোযোগ শুরু হয়েছে। পর পর তিনটে গুলির শব্দ। তারপর অস্ফুট আর্তনাদ। ফটকের ধারের ভিড় সরে গেছে! একটা কসাক সৈন্য মুখ থুবড়ে পড়েছে কাদার উপর। আর একটা গুলির শব্দ, ফটকের লোহার দরজা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো। কারা ঢিল ছুঁড়ছে! চারদিকে গোলমাল, ওকি, হঠাৎ লোকগুলো পালাচ্ছে কেন? ঐ যে ওরেশনিকভ প্রাণপণে ছুটছে! তেলেগিণ এবার দেখতে পেল। প্রকাণ্ড ফটক খুলে গেছে! কসাক সৈন্যদের হাতে রাইফেল।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, কটুগন্ধে, ধোঁয়ায় ভরে গেছে চারদিক। ওরেশনিকভ পালাতে পারেনি। কাদার মধ্যে ওর দেহ পাওয়া যাবে।

পরের সপ্তাহে তেলেগিণকে অফিসে ডাকা হল। তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে শ্রমিকদের বন্ধু বলে। তেলেগিণ ম্যানেজারকে কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে চাকরী ছেড়ে দিল।

দশ

ডাশা দু সপ্তাহ হল তেলেগিণের কাছে বিদায় নিয়েছে। তেলেগিণ সামারা পর্যন্ত তার সংগে এসেছিল। তারপর চলছে একঘেয়ে জীবন। ডাশা চায়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বাইরের দিকে তাকালো—পথে উড়ছে ধুলো। দু বছর তার কেটেছে যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে, আবার সে বাড়ি ফিরে এসেছে।

"আর্ক ডিউককে কারা খুন করেছে," তার বাবা ডাক্তার ডিমিট্রি স্টেপানোভিচ্ বুলেভিন কাগজ পড়তে পড়তে বল্লেন।

"কোন্ আর্ক ডিউক বাবা?"

"তার মানে? অষ্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক, সেরাজেভোতে নিহত হয়েছেন।"

"অল্প বয়েসী?"

"জানি না। আর একটু চা দে ত? তারপর, কাটিয়া কি নিকোলাইকে ছেড়ে চলে গেল?"

"আমি ত বলেছি তোমাকে।"

"তবু ও—"

ডাক্তার কাগজ পড়তে শুরু করলেন। ডাশা জান্‌লায় এসে দাঁড়িয়েছে, বাইরে কী অন্ধকার। তার মনে পড়লো: শাদা ষ্টীমার, সূর্যের সোনালী আলো, নীল আকাশ আর তেলেগিণ। তেলেগিণ। তেলেগিণের মনের কথা সে জানত, কিন্তু সে চেয়েছিল তাকে প্রেম জানাতে ধীরে ধীরে।

সামারার কাছে যত তারা এসে পড়ছিল, তেলেগিণ অধীর হয়ে উঠছিল। ডাশা কিন্তু অধীরতাকে আমোল দেয়নি। যে স্বপ্ন তারা তৈরী করেছে দুজনে-গুঞ্জনে, প্রেমের আবির্ভাবে গুঁড়িয়ে যাবে তার স্বপ্ন, মাধুর্য যাবে মিলিয়ে। প্রেম ত আছেই, তার আগে চাই বন্ধুত্ব। তেলেগিণ চার রাত্রি ঘুমোয়নি, ডেকে পায়চারি করে কাটিয়েছে।

সামরায় তেলেগিণ ষ্টীমার বদল করলো। সূর্যালোকিত তরংগে ভেসে চলতে চলতে ভেঙে গেল স্বপ্ন। স্মৃতির ধুলো শুধু এখন জমেছে।

অষ্ট্রিয়ার ওরা এবার সার্বদের দেখে নেবে। প্যাঁস্‌নে মুছতে মুছতে বল্লেন ডাশার বাবা। ··· স্মৃতির ধুলো জমেছে ...

"শ্লাভদের সম্বন্ধে তোমার কী মত?"

"জানি না।"...স্মৃতির ধূলো।

ডাশার বাবা এবার স্লাভ সভ্যতা সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন।

ডাশা বাধা দিয়ে বল্ল, "তুমি রুগী দেখতে বেরুবে না?"

"না, আজ আর যাব না, হাঁ, কি বলছিলাম, স্লাভদের কথা।

ঘণ্টা বেজে উঠলো। "ঝিটা কোনো কাজের নয়। কোন দিন আমি ওর মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেব।" ডাশার বাবা বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই একখানা চিঠি নিয়ে ঢুকলেন।

"কাটিয়ার চিঠি।"

ডাশা চিঠিখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্যারি থেকে চিঠি লিখছে কাটিয়া। অনেক দিন তোমার আর নিকোলাইর কোনো খবর পাইনি। আমি এখন আছি প্যারিতে। এখানে এখন বসন্ত বিলাসিনী-দের হাট বসে গেছে। প্যারি আমার কাছে খুবই ভালে লাগছে। সবাই যেন এখানে রাতদিন শুধু নাচছে আর হাসছে। লাঞ্চে নাচ, ডিনারে নাচ। নাচতে নাচতে রাত কাবার করে সবাই বাড়ি ফেরে। বাজনা কিন্তু আমার ভালো লাগে না। কেমন যেন মিঠে বিষাদ অনুরণিত হয়ে উঠে ওদের বাজনায়, মনে হয়, যৌবন বুঝি চলে গেছে।

ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে উঠি, যখন দেখি নগ্ন-প্রায় পোষাকে দেহকে অশ্লীল ভাবে প্রকাশ করে চলেছে মেয়ের দল। চোখের নীচে জমেছে অত্যাচারের কলংক রেখা। ওদের প্রেমিকদের চোখে মুখে বিরংসার ছাপ। মনটা যেন কেমন অস্থির লাগছে। মন যেন বলছে: একটা দুঃসংবাদ পাব। বাবার জন্যেই যত উৎকণ্ঠা। বুড়ো মানুষ। পথে ঘাটে এত রাশিয়ার লোকের ভিড়। মনে হয়, পিটাসবুর্গেই বুঝি আছি। ভালোকথা, এখানে এসে খবর শুনলাম—নিকোলাই নাকি এক বিধবার প্রেমে পড়েছে—তিনটি সন্তানের মা, একটি একেবারে শিশু। প্রথমটায় খুব আঘাত পেয়েছিলাম। এখন দুঃখ হচ্ছে ঐ ছোট্ট শিশুটির জন্যে। আমিও একটি শিশু চেয়েছিলাম, কিন্তু নিকোলাইর কাছ থেকে নয়, যাকে ভালোবাসি তার কাছ থেকে। তুমি বিয়ে করলে, এতদিনে তোমার কোলেও একটি রাঙা টুকটুকে খোকা আসত।"

ডাশা চিঠিটা পড়ে কাঁদলো। বিধবার ছোট শিশুটির জন্যে ওরও কষ্ট হয়েছে। তারপর উত্তর লিখতে বসলো।

দুদিন কেটে গেছে। রাতদিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি! আকাশ থম্‌থমে মেঘে ভরা। রবিবার দিন সকালে বর্ষণ ক্লান্ত আকাশে সূর্য উঠলো।

ডাশা ড্রয়িংরুমে বসেছিল। সকালের মেঘ-ভাঙা রোদটা বেশ লাগছে। এমন সময় সেমিয়ন সেমিনোভিচ গোভিয়াডিন এসে হাজির। জেমস্‌টোভো অফিসে সে চাকরি করে।

"বহুদিন, বহুদিন পরে দেখা। চল, আজ ভলগায় বেরিয়ে আসা যাক।"

ডকে এসে ওরা পৌছুল। চারদিকে প্যাকিং কেস, তুলোর বস্তা, স্তূপীকৃত কাঠ। বস্তা ঠেস দিয়ে কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউবা খেলছে। আর একদিকে ষ্টীমারে মাল তোলা হচ্ছে। একটা মাতাল, সর্বাংগ কাদা মাখা, চিবুক থেকে পড়ছে রক্ত, বিড বিড করে বকছে।

"জানো ডাশা, এরা ছুটি কাকে বলে জানে না। —সেমিনোভিচ বল্ল,"অথচ আমরা চলেছি ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে। সমাজ ব্যবস্থার এ অবিচার।"

ডাশা কোনো কথা বল্ল না। ভলগার বিস্তীর্ণতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সেমিনোভিচ একখানা নৌকা ভাড়া করলো। ডাশা দাড ধরলো, হালে বসলো সেমিনোভিচ নিজে। তর তর করে ভেসে চললো নৌকা। সেমিনোভিচের কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সরু সরু হাত দুটোর শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলো, "শুনলাম, তোমার নাকি বিয়ে ?"

"কে দিলে তোমাকে এমন সুসংবাদ ?"

"ঠাট্টা নয়, সত্যি ?"

"কই আমি ত জানি না।" ডাশা হাসলো।

নৌকা ভেসে চলেছে, সেমিনোভিচ গান ধরেছে ক্ষীণ গলায় :

"ভলগা মায়ের বুকের ওপর দিয়ে আমরা চলেছি ভেসে ..

হালে পড়ছে ক্ষিপ্র টান, নৌকা দুলছে।

আর একটা নৌকা ওদের কাছে এল। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তিনটি মেয়ে খোসা ছাড়িয়ে বাদাম খাচ্ছে। তাদের পাশে বসে একটা মাতাল বেহালায় বাজাচ্ছে পোল্‌কার গৎ।

দুজন লোক দাঁড টানছে। সেমিনোভিচের দিকে তাকিয়ে তাদের একজন বল্ল, "এই উল্লুক, নৌকা সরিয়ে নে।"

সেমিনোভিচ উত্তর দেবার আগেই তারা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নৌকাটা দুলছে ছোটো ছোটো ঢেউয়ের ঘায়ে।

ওদের নৌকা-ভ্রমণ শেষ হল অনেক বেলায়।

সেমিনোভিচ মন্তব্য করলো : "পুরো সহরবাসী হলেও মাঝে মাঝে এমনি করে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমার ভালো লাগে। আজ ত আরো ভালো লাগছে, তুমি রয়েছ পাশে। চল না একটু ঘুরে যাই।

বালি তেঁতে উঠেছে সূর্যের তাপে। তারই ওপর দিয়ে ওরা চললো সেমিনোভিচ মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল আর বলছিল, "চমৎকার !"

বালি শেষ হয়ে গেছে, এবার উঁচু জমি। ছাটা ঘাস, কি একটা ফুলের তীব্রগন্ধ। সুতোর মত একটা ক্ষীণ জলের ধারা ঘাসের ভেতব দিয়ে ঝিরঝিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এখানে ওখানে দু-একটা লাইম গাছ, একটা বাঁকা পাইন, ডালটা ঝুঁকে পড়েছে হাতের মত। জলেব ধাবে ধাবে ঝোপ, কাদা-খোঁচাদের আবাস। ডাশা আর সেমিনোভিচ বসে পডলো ঘাসের উপর। জলে পডেছে আকাশের নীল বং চুইয়ে, তাবই মাঝে মাঝে সবুজ পাতার ঝালব কাঁপছে। পাখীর একঘেয়ে সুব। কোন গাছেব কোটরে একটা বুনো পায়রা ডাকছে, ব্যর্থপ্রেমের বিলাপ যেন। ডাশা কান পেতে শুনলো। গলে গলে পডছে করুণ সুব, উৎসাবিত হৃদযেব ব্যথা! বন, নদী, আকাশ, পাখীর দল, সবাই শুনচে নীববে।

"ডাশা।"

ডাশা ঘাসের উপর চিৎ হযে শুয়ে পডে বল্ল, "কি সেমিনোভিচ?"

"আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।"

"বল।" ডাশা আড চোখে তাকিযে দেখলো চোখ দুটোয তাব অসুস্থ উজ্জ্বলতা। সেমিনোভিচ তাকিযে আছে তাব পাযেব দিকে—যেখানে শাদা মোজা এসে মিশেছে মাংসল উরুর প্রান্তে।

"তুমি গর্বিত, তোমার নতুন যৌবন, রক্ত ফুটছে টগ্‌বগ্‌ কবে

"বেশ তাবপর?" ডাশা চোখ বুজলো।

"ডাশা, ডাশা, তোমার কি ইচ্ছে কবে না এই পুবোনো, পচা নীতিবাদেব বেডা ভেঙে বেবিযে আসতে? তোমাব ইচ্ছে করে না, নীতির অনুশাসন ডিঙিয়ে প্রবৃত্তিব হাতে নিজেকে সঁপে দিতে?"

"বব, প্রবৃত্তির হাতে আমি সঁপে দিযেছি নিজেকে, তারপর?"

ডাশাব আবেশ এসেছে চোখে। সূর্যেব আলো খেলা কবছে ওব মুখে, চোখে, চুলে।

সেমিনোভিচ কথা বল্ল না। হযত, তাব স্ত্রীব কথা, ছেলেমেয়ের কথা মনে পডেছে। নীতিব ঢাকনিটা মনেব উপব এঁটে বসেছে। মিলিয়ে গেছে সূর্যালোকিত দিন, নীল আকাশ, ভলগার তরংগ। সংসারের ঘূর্ণী। মামুলি ঝগডা, দৈনন্দিন অভাব, একঘেয়ে বিশ্রী দিন, দিনের পব দিন।

অনেকক্ষণ পবে সেমিনোভিচ নীরবতা ভাঙলো: "জানি, সহজ, সরল তুমি হতে পারবে না। তোমাকে বাধা দেবে তোমার শিক্ষা, তোমার পরিবেশ। নইলে এই নীল আকাশেব নিচে তোমাব মনে একটা বলিষ্ঠ কামনার সাডা পাচ্ছ না?"

"না," অলসতা, কী মধুব অলসতা, ডাশা ভাবলো। মাথার ওপরের ঝোপ থেকে আসছে বুনো গোলাপের ক্ষীণ গন্ধ, একটা মৌমাছি গুন গুন করছে। পায়রাটা

এখনও ডাকছে। কি বলছে ? ডাশা, ডাশা ভালোবেসেছ তুমি, তুমি ভালো-বেসেছ।

ডাশা হাসলো।

ওকি ! ডাশা লাফিয়ে উঠে বসলো ! সেমিনোভিচের কুশ্রী আঙুলগুলো ওর উরুর ওপর চেপে বসেছে, ঘৃণ্য জ্বালা ধরেছে সর্বাংগে। ডাশা জুতো খুলে দু ঘা বসিয়ে দিল ওর গালে।

"লম্পট, ইতর কোথাকার !' ডাশা জুতো পায়ে দিয়ে নদীর দিকে চললো। সেমিনোভিচের দিকে ফিরেও তাকালো না।

"কি বোকা আমি, কি বোকা ! ঠিকানাটাও জিজ্ঞেস করে রাখিনি"—ডাশা আসতে আসতে ভাবলো। "এখন ঐ সেমিনোভিচটার সংগে সময় কাটাতে হচ্ছে, হায় ভগবান !' সে ফিরে তাকালো। সেমিনোভিচ আসছে, শিকারী কুকুরের মত তীক্ষ্ণ, সজাগ দৃষ্টি। "কাটিয়াকে আমি চিঠি লিখব। আমি, আমিও শেষে প্রেমে পড়লাম !" ডাশা মৃদুস্বরে আওড়ালো, জিভ দিয়ে যেন লেহন করে বল্ল : প্রিয়, প্রিয় তেলেগিণ।

কাছের ঝোপের মাঝে কারা কথা কইছে। "না, না, আমি, আমার ভয় করছে, ছাড়ো, ছাড়ো, আমার স্কার্ট ছিঁড়ে যাবে।" একটা আদুল-গা লোক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ের স্কার্ট ধরে টানছে। কী অশ্লীল ভঙ্গী তার দেহে, কী লেলিহ কামনা তার মুখে ! ডাশা ছুটতে লাগলো, সে ভয় পেয়েছে। এখনও কানে আসছে : "ছাড়ো, ছাড়ো, আমার স্কার্ট ছিঁড়ে যাবে।"

এই ঘটনার পর থেকে সামারার জীবন হয়ে উঠলো আরো দুর্বহ, আরো বিশ্রী। পথে পথে নোংরা, চারদিকে উঠছে অসহ্য মিষ্টি গন্ধ, বাক্সের মত বাড়ির সার, গাছপালার সন্ধান মেলে না। টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের খুঁটিগুলো আকাশের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তার ওপর দুপুরের অসহ্য গরম। উঃ, গা পুড়ে যায়। কানে আসে মেছুনিদের একটানা চিৎকার : "মাছ নেবে গো, তাজা, টাটকা মাছ ?" পাগলা কুকুরগুলো ডেকে ওঠে। দূরে কোনো বাড়ীর থেকে ভেসে আসে ক্লান্তিকর একটা বাজনার সুর।

ডাশা নিজেকে প্রশ্ন করলো : এই ক্লান্তি, এই একটানা একঘেয়েমি—এর জন্যে দায়ী কে ?

"তেলেগিণ, তেলেগিণ, নিশ্চয়ই তেলেগিণ !"

তেলেগিণই দায়ী ! ডাশা তাকে ভালোবাসে এ কথা জেনেও সে কেন চিঠি লিখছে না ? সামারার এই ধূলো আর সূর্যহীন বিষণ্ণতায় কেন তাকে রেখে চলে গেল ? মনের ঔজ্জ্বল্য যেন নিভে গেছে, সেখানে পুঞ্জীভূত মেঘ, মৃত্যুর নিরাশা !

গরম অন্ধকার রাত, ঝুলে ঝুলে রয়েছে এক ঝাঁক কুৎসিত নিবয়ব জীব, মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায়, তাদের পাখার ঝাপটানি ওঠে, কুশ্রী ধারালো ঠোঁট বার করে ধেয়ে আসে তারা। বুকে অসহ্য জ্বালা! ডাশা বাঁচতে চায়, এই অন্ধকার,—এই কুৎসিত অন্ধকার আর ধুলো উত্তীর্ণ হয়ে আলো আর আনন্দে ডাশা বাঁচতে চায়।

কাটিয়ার দ্বিতীয় চিঠি এসেছে: "রাশিয়ার জন্য মন কেমন করছে। নিকোলাইর সংগে এই বিচ্ছেদের জন্য নিজেকেই দায়ী করতে ইচ্ছে হচ্ছে। প্রতিদিন কাটছে অন্তর্দ্বন্দ্বে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। আগের চিঠিতে লিখেছি, কি একটা লোক কয়েক দিন ধরে আমার পেছু নিয়েছে। বাড়ী থেকে বেরুলেই ওকে দেখতে পাই। হয়ত কোনো দোকানে যাব, লিফ্‌টে চড়েছি, দেখি ঠিক এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সেদিন লুভারে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা করছিল, পাশেই একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম। ওমা, পিঠে কে হাত রেখেছে! চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলাম, সেই লোকটা। রোগা ঝাঁকড়া চুল; চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে। ওকে দেখেই ছুটে বেরিয়ে এলাম। ওকে দেখলে আমার বুক অজানা আশংকায় কেঁপে ওঠে। এক যাদুকর যেন আমার চারপাশে গণ্ডী আঁকছে,…"

ডাশা বাবাকে চিঠি দেখালো।

পরদিন কাগজ পড়তে পড়তে তিনি বল্লেন, "তুই ক্রিমিয়ায় চলে যা।"

"কেন?"

"নিকোলাইকে বুঝিয়ে বলবি। সেটা একটা আস্ত গাধা! তার এখন প্যারিতে যাওয়া দরকার।… কিইবা হবে ভেবে? ওদের ব্যাপার, ওরা যা ইচ্ছে করুক গে!"

বুলেভিন রেগেছেন। ডাশা ঠিক করলো সে ক্রিমিয়ায় যাবে। এখনো কাটিয়া-নিকোলাইর ব্যাপারের মীমাংসা হতে পারে। ডাশা হঠাৎ খুসি হয়ে উঠলো। ক্রিমিয়া, ক্রিমিয়া! এই ধুলো আর অনুজ্জ্বল দিন, পুঞ্জীভূত বিষাদ আর দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নীল সমুদ্র গর্জন করছে, সারি সারি পপলার দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে, একটা পাথরের বেঞ্চ পাতা, সমুদ্রের হাওয়া চুলে খেলা করছে, কার অস্থির দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করে ফিরছে… ক্রিমিয়া, ক্রিমিয়া!

ডাশা ক্রিমিয়া রওনা হল।

এগারো

ক্রিমিয়ায় এবার খুব ভিড়। এ বসন্তে সারা রাশিয়া যেন ভেঙে পড়েছে। পথে পথে, পিটার্সবুর্গ, মস্কো আর কীয়েভের লোক। সমুদ্রের পাড়ে, ঘন পপলারের ছায়ার তলায় বসেছে তরুণ তরুণীদের হাট, কুজনে গুঞ্জনে মুখর হাওয়া। পারিবারিক আবহাওয়া, সূক্ষ্ম নীতিবোধ কোথায় মিলিয়ে গেছে। অগাধ অফুরন্ত জীবন। গরম বালির উপর প্রাচুর্যে উদ্বেল নরনারী। এতটুকু সংযম নেই, বাঁধন নেই, আছে উদ্দামতা, আছে জীবনের তরংগ। এই নীল সমুদ্র, সূর্যালোকিত ধারালো দিন, ধূ ধূ করা উত্তপ্ত বালুবেলা—এখানে বুঝি সবই স্বাভাবিক, সবই সম্ভব! বসন্ত ফুরিয়ে গেলে তারা ফিরে যাবে নগরের কোটরে। সেই একই খাতে বয়ে-যাওয়া জীবনে আসবে আজকের এই উদ্বেল আনন্দের স্মৃতি। খতিয়ে দেখবে, কী পেল তারা? ওদিকে একটানা বৃষ্টি পড়বে বাইরে, ভেতরে বাজবে টেলিফোন। আজ কে চায় তা ভাবতে? আজ সমুদ্র বালুবেলার উপর আছড়ে পড়ছে, আকাশ ফস্‌ফরাস-ঝলা। আজ শুধু চোখ বুজে গরম বালির উপর শুয়ে-শুয়ে উপভোগ কর জীবন। সোজা, সরল হয়ে যাবে বাঁকা-চোরা গলিগুলো। জীবন আজ কত সরল, বিপদও আজ কত মিষ্টি। তারপর আছে ভয়াল অনুতাপ, সে ত আসবে শীতের বৃষ্টি ধারা মুখে করে।

ডাশা এক বিকেলে ইউপেট্রিয়ায় এসে পৌঁছুলো। শাদা পাথরের রাস্তা ফিতের মত বিছিয়ে আছে। এখানে ওখানে জলাভূমি, কোন গোল, বাড়ির খড়ের গাদা। সমুদ্রের নোনা গন্ধ হাওয়ায়। গাড়ীতে একটি আর্মেনীয় তরুণী তাকে বল্ল: "এইবার সমুদ্র দেখতে পাবেন।"

গাড়ী বেঁকলো, এবার সমুদ্র দেখা দিয়েছে। গাঢ় নীল সমুদ্র, শাদা ফেনার ডোরা কাটা। গাড়ীটা হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিতেই ডাশা মনে মনে বল্ল: "এবার শুরু হল।"

সমুদ্রের পাড়ে ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে কফিখানা করা হয়েছে। ওরই একটাতে বসে নিকোলাই একজনের সংগে কফি খাচ্ছে। দুপুরে ঘুম সেরে সবাই এসেছে। গল্প করছে মেয়ে আর সমুদ্র স্নানের। এক টেবিলে গোল হয়ে বসে কয়েকজন লোক মদ খাচ্ছে। একটা ইয়াট পাল তুলে চলেছে। নিকোলাই দেখছিল।

"শুনছ নিকোলাই! আমি একটা নাটক লিখছি।···আমার নায়িকা পারিপার্শ্বিকতার উপর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। নিরীহ গোবেচারী লোকগুলো, অথচ ভেতরটা ক্ষয়ে গেছে মদে আর দমিত কামনায়। জীবনের সাড়া নেই···এখানে আমি মেয়েটির মুখ দিয়ে

বলিয়েছি : 'চলে যাব, এ জীবন থেকে পালিয়ে যাব যেখানে আছে আলো ··· তারপর ভাবছে তার স্বামীপুত্রের কথা। কোলাই, জীবন তাদের নিঃশেষিত হয়ে গেছে, নায়িকা চলে গেল—কোন প্রেমিকের কাছে নয়, এমনি।"

নাট্যকার-বন্ধু নীরব হল। দুজনে বসে মদ খাচ্ছে। অতীত স্মৃতি, পুঞ্জীভূত অশ্রু ধুয়ে ফেলছে মদে। চিমনির ভেতর হাওয়ার গোঙানি। চারদিক বিষণ্ণ, ·· নিঃসংগ অন্ধকার ··

"আমার এ সম্বন্ধে কি মত জানতে চাইছ?" এক সময় নিকোলাই বল্ল।

"হ্যা। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বলবে, লেখা ছেড়ে দাও।"

"না, না, চমৎকার হয়েছে নাটকটা, এই ত জীবন।" নিকোলাই চোখবুজে মাথা নাড়লো। "মিশা, আমরা সুখের দিনকে জীইয়ে রাখতে জানি না, সে চলে যায়। তারপর আসে নিরাশা আর মদ। আমাদের কবরের ওপর দিয়ে বিষণ্ণ ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়।"

"কোলাই," বন্ধুটি তার দিকে তাকিয়ে বল্ল, "তুমি কি কখনও জানতে পেরেছ, আমি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসি?"

"হ্যা।"

"তুমি আমার বন্ধু, তোমার কথা ভেবে কতদিন প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমার বাড়ি আর যাব না ··· কিন্তু থাকতে পারিনি। ছুটে গেছি তোমার বাড়ি, ভাড়ের অভিনয় করেছি ··· নিকোলাই, তুমি তোমার স্ত্রীকে দোষী করতে পার না।"

"মিশা, সে নিষ্ঠুর।"

"হয়ত তাই ··· কিন্তু দোষ কি আমাদেরই নেই?"

"আমি বুঝতে পারি না কোলাই, তার সংগে এতদিন কাটিয়ে তুমি কী করে আজ সোফিয়া ইভানোভনার মত মেয়েকে সহ্য করচো?"

"জটিল প্রশ্ন করেছ তুমি।"

"মিথ্যে কথা! এর মধ্যে জটিলতা নেই। অতি, অতি সাধারণ মেয়ে সোফিয়া।"

"তা কি আমি জানি না মিশা? কিন্তু তার মায়া আছে, মমতা আছে। কাটিয়ার তা নেই।"

"কোলাই, পিটার্সবুর্গে ফিরে আর তোমাদের বাড়িতে যাব না। যাবই বা কার জন্যে? তোমার স্ত্রী এখন কোথায়?"

"প্যারিতে।"

"তুমি তাকে চিঠি লেখ!"

"না।"

"চল, দুজনে আমরা প্যারি চলে যাই।"

"বৃথা—"

অভিনেত্রী চারোডিয়েভা এসে ওদের পাশের টেবিলে বসলো। স্বচ্ছ সবুজ পোষাকে মোড়া দেহ, প্রকাণ্ড টুপি মাথায়। সাপের মত লিকলিকে, মনে হয় মেরুদণ্ড নেই, এখনই এলিয়ে পড়বে। কোনো এক পত্রিকার সম্পাদক সংগে।

"আশ্চর্য মেয়ে"—নিকোলাই বল্ল।

"নিকোলাই, তুমি ভুল করেছ। কি আছে ওর? দেখছ না কি বিশাল মুখের হা—চোখ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এ মানুষ নয়, শেয়াল।"

চারোডিয়েভা দেখতে পেয়ে ওদের টেবিলে এল।

"মিনস্কা, পোষাকটায় তোমাকে কী সুন্দর মানিয়েছে।" নাট্যকার বন্ধুটি বল্ল।

"কাল রেস্তরাঁয় বসে আমার সম্বন্ধে কি সব না কি তুমি বলেছ?"

"হাঁ, আমি তোমাকে গালাগাল দিচ্ছিলাম।"

চারোডিয়েভা তার শীর্ণ আংগুল দিয়ে নাট্যকারের গালে আঘাত করলো: "দুষ্টু কোথাকার। (নিকোলাইর দিকে ফিরে) আপনার ঘরে একটি মেয়ে বসে আছে, দেখলাম।"

নিকোলাই বন্ধুর দিকে তাকালো, তারপর দগ্ধ চুরুট চেপে নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"কে আবার এল? যাই দেখে আসি।"

'ডাশা। তুমি এখানে?' নিকোলাই দরজা বন্ধ করে দিল।

"এই চিঠিগুলো পড়ে দেখুন।"

নিকোলাই চিঠি নিয়ে জানলার ধারে চলে এল। ডাশা চলে গেল কাপড় ছাড়তে। ফিরে এসে দেখলো চিঠি হাতে নিয়ে নিকোলাই বসে আছে।

"তুমি এখনও লাঞ্চ খাও নি?" নিকোলাই জিজ্ঞেস করলো। "চল রেস্তরাঁয় গিয়ে বসি।" ডাশা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। নিকোলাই কাটিয়াকে আর ভালোবাসে না। প্যারির কথা আজ না তোলাই ভাল, কাল সুযোগ বুঝে বলবে।

হলদে বালি জুতোর ঘায়ে ছড়াতে ছড়াতে তারা চললো, ঝিনুকগুলো চক চক করছে পড়ন্ত সূর্যের আলোয়। তরংগ এসে ভেঙে পড়ছে বেলাভূমির ওপর, শাদা ফেনার বুদ্বুদ ছড়িয়ে পড়ছে, ছিটিয়ে পড়ছে। দুটি তরুণী মদের বোতলের ছিপির মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। ডাশা আর একটু এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঢেউ স্পর্শ করলো, হাত ভিজে গেছে। একটা কাঁকড়া গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল।

"অনেক বদলে গেছ, ডাশা," নিকোলাই নীরবতা ভাঙলো। "এবার তোমার বিয়ে করা উচিত।"

ডাশা ফিরে তাকালো, রহস্যময় দৃষ্টি তার চোখে।

হোটেলে আলো আর গোলমাল। প্রজাপতির মত চঞ্চল মেয়ের দল। হাসি, গল্প, অফুরন্ত আনন্দের স্রোত, ভেসে আসছে গ্লাসের টুং টাং, ফিসফিসানি, হাসি-তর্ক—সমুদ্রস্নানের উপকারিতা, সাহিত্য, শিল্প, মঞ্চ নিয়ে। ডাশা বাইরে বেরিয়ে এল। কি অপূর্ব বাতাবরণ বাইরে। আরব্য রজনীর মত চাঁদ নেমে এসেছে একেবারে কাছে, তারা নেই আকাশে, সমুদ্র স্বপ্ন-বিভোর। ডাশা দুহাত দিয়ে বুক চেপে ধরলো। একটি তরুণ, এক তরুণীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। ডাশাকে কে অনুসরণ করছে। অন্ধকারে দেখা যায় না, শুধু অনুভূত হয় তার নির্নিমেষ চোখের স্পর্শ। কে যেন ডাকছে "ডাশা, ডাশা।" হায়, তেলেগিণ যদি এসে আজ বলতো: "আমার, তুমি আমার?" ডাশা কি বলতো? "হা তোমার, আমি তোমার।'

ডাশার পাশ দিয়ে স্বল্পান্ধকারে কে চলেছে দীর্ঘ ছায়ার মত' চাঁদের আলো এসে মুখে পড়তেই ডাশা চমকে উঠলো। বেসনভ। বেসনভ।

বারো

বেসনভের কাছে বিশ্রী লাগছে এই সমুদ্র পারের জীবন-ধারা। আলো আর হাসি আর সমুদ্রের একঘেয়ে গর্জন। একদিন নিজন ছিল সমুদ্র, নির্জনে বালির উপর ছড়িয়ে যেত, নিঃশব্দে মরে যেত, থাকত বালির উপর জলের দাগ, সমুদ্রের ঝিনুক আর সরীসৃপের কংকাল সূর্যের আলোয় চক্ চক করতো। এখন জনারণ্য সেখানে। এরা একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে, সমুদ্র তখন আবার নিঃসংগ।

কাল রাতে সে সমুদ্রের পারে কাটিয়েছে। কে একটি মেয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়েছিল অনিমেষে, ভায়োলেটের ক্ষীণ গন্ধ আসছিল। কে মেয়েটি, কে জানে। তবু তন্দ্রাভিভূত মগজে আলোড়ন উঠেছিল, কোন এক স্মৃতি। টোপ আর সে গিলবে না, মেয়ের ফাঁদে আর পড়বে না। সে হোটেলে চলে এল।

ডাশার ভয় করছিল। সে ভেবেছিল, বেসনভ তার জীবন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় বেসনভ মিলিয়ে যেতেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। পিটার্সবুর্গের সেই সন্ধ্যা, সেই শীর্ণ মুখ, বিষন্ন চোখ। চাঁদের আলোয় কামনার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে বুকে। ডাশা তাকে ভালোবাসে না, তার চিন্তায় বিষাক্ত করতে চায় না মন্থর শান্ত রাত্রি, শুধু তাকে অনুভব করতে চায় সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।

রাতে বিছানায় শুয়ে তার ঘুম এল না। বালিসে মুখ গুঁজে সে বার বার বল্ল: "ভালবাসি, তেলেগিণকে ভালোবাসি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ওকে আমি বিয়ে করবো।"

সমুদ্রের তরংগ আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন বিকেলে বেসনভের সংগে আবার দেখা। বেসনভ নির্জন পথের ধারে একটা পাথরের উপর বসেছিল। ডাশা দৌড়ে চলে যেতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। পা যেন ভারী হয়ে এসেছে, শিকড় গজিয়েছে। ডাশাকে দেখতে পেয়ে বেসনভ টুপি তুলে নমস্কার জানালো নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মত।

"আমি ভুল করিনি। কাল রাতে আপনাকেই দেখেছিলাম সমুদ্রের ধারে?"

"হাঁ আমি—"

"সূর্যাস্তের সংগে সংগে এখানে যেন মরুভূমি নেমে আসে।" বেসনভ চারদিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বল্ল। "চারদিকে ঝোপ পাথর—আর নির্জনতা। মনে হয় মানুষই বুঝি নেই পৃথিবীতে। এই আমার ভালো লাগে।"

বেসনভ হাসলো।

ডাশা মন্ত্রমুগ্ধের মত চলেছে ওর সংগে। বুনো ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে, কেমন ঝিমুনি লাগে, দু-একটা বাদুড় উড়ছে চক্রাকারে, চারদিকে গোধূলির ম্লানিমা।

"প্রলোভন, প্রলোভন—ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই," বেসনভ বল্ল, "ওরা প্রলুব্ধ করবে, টেনে নিয়ে যাবে, তারপর প্রতারিত করবে।" চাঁদের দিকে তাকিয়ে বল্ল: "ঐ চাঁদের কথাই ধরুন না। সারারাত ধরে শিকারীর জাল বুনছে, এই পাথুরে পথের রং বদলে দিচ্ছে, ঝোপে ঝোপে আনছে মায়া। একটা মৃতদেহকেও সুন্দর করতে জানে চাঁদ, নারীর মুখে আনে রহস্য। কে জানে, হয়ত এর প্রয়োজন আছে, হয়ত এই প্রতারণার নামই জীবন।"

"আমি আর যাব না," ডাশা হঠাৎ বল্ল, "আমি এবার সমুদ্রের ধারে ফিরব।"

"পিটার্সবুর্গের সে রাত্রির কথা আমার মনে আছে। আপনি ভয় পেয়েছিলেন।" বেসনভের কণ্ঠ ধীর, গম্ভীর। ডাশা দ্রুত চলতে লাগলো। "আপনার সৌন্দর্য আমাকে সেদিন অভিভূত করেনি, করেছিল আপনার স্বর। আমি অভিভূত হয়ে গিছ্‌লাম। শেষ বিচারের দিনে দেবদূতের ডংকা-নিনাদ যেন ঝরে পড়ছিল আপনার স্বরে?"

"কি পাগলের মত বলছেন?" ডাশা বল্ল।

"ওর চেয়ে বড় প্রলোভন আমার জীবনে আসেনি। আমি আপনার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম: "এইখানেই মুক্তি, আমার মুক্তি।"

ডাশা প্রার্থনা করলো: "ঈশ্বর, ঈশ্বর, এর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।"

"আজ একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাক, ডারিয়া দিমিট্রিভ্‌না। কে পুড়বে আগুনে—আপনি না আমি?

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।" ডাশা উত্তর দিল।

"মানুষ যখন নিঃসংগ, সহায় সম্বলহীন তখনই শুরু হয় তার সত্যিকারের জীবন। নইলে এই চাঁদের আলো, এই আনন্দের কলকাকলী—এর চাইতে বড় মিথ্যেও আর নেই। জীবন হবে ভয়াল, ধারালো—প্রকৃত জ্ঞান ত সেখানে। সেই জীবনকে গ্রহণ করতে হবে আমাদের। আপনি রাজী ?"

ডাশা কোনো কথা বল্ল না। ডাশার ঠাণ্ডা হাত দুখানা বেসনভ নিজের হাতে তুলে নিল।

অনেক্ষণ চুপ করে থেকে বল্ল, "চলুন ফেরা যাক।"

হোটেলে ডাশাকে পৌছে দিয়ে বেসনভ সমুদ্রের ধারে এল। আবছা আলোয় হাঁটছে। হঠাৎ সে থামলো। জলের ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"শুভ-সন্ধ্যা, নিনা।"

"শুভ সন্ধ্যা।"

"এখানে কি করছ ?"

"দাঁড়িয়ে ছিলাম এমনি।"

"একা ?"

"তোমার কি ?"—চারোভিয়েভা খেঁকিয়ে উঠলো।

"এখনও তুমি আমার উপর রেগে আছ ?"

"না।"

"নিনা, তবে চল আজ রাতে আমার ঘরে।"

"তুমি কি পাগল হয়েছ বেসনভ ?" চারোভিয়েভা বেসনভের মুখের দিকে তাকালো।

"তুমি কি তা জান না ?"

বেসনভ ওর হাত ধরতে গেল, চারোভিয়েভা হাত সরিয়ে নিল।

দুজনে পাশাপাশি নিঃশব্দে বালির উপর হাঁটছে। জলের উপর চাঁদের ছায়া।

"ডাশা, ওঠ, ওঠ," কফি খেতে বেরুব আমরা।

ডাশা শুনলো বন্ধ দরজায় নিকোলাই করাঘাত করছে। সে উঠে বসলো। মেঝের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে জুতো আর মোজা—ধূসর বালি-ভরা। কিছু একটা ঘটেছে কাল। আবার কি সেই বিশ্রী ঘৃণ্য স্বপ্ন দেখেছে ? স্বপ্ন নয়, সত্যি ! ডাশা স্নানের ঘরে ঢুকলো।

জলের ধারায় সজীবতা নেই, আছে অবসাদ। হাঁটুর উপর হাঁটু চেপে সে বসে রইল :

"কেমন ধারা লোক আমি ! মতিস্থির নেই !" ডাশা মাথা উঁচু করে তাকালো সমুদ্রের দিকে। চোখে তার জল। ... নিজেকে বাঁচিয়ে চলছি, কিন্তু কি এমন রত্ন ?

কেউ ত চাইলে না। কাউকে ভালোও বাসতে পারলুম না। ওর কথাই ঠিক। সব পুড়িয়ে সত্যিকারের জীবন পেতে হয়। আজ রাতে ও আমাকে যেতে বলছিল ··· না, না।”

ডাশা হাঁটুর উপর মুখ রাখলো, কী গরম। না, কুমারী-জীবন এবার তার শেষ করে দিতেই হবে, নইলে অশেষ দুঃখ তার।

সে মনে মনে ভাবলো: “এক উপায় আছে। আইন পরীক্ষাটা যদি পাশ করি, তাহলে আদালতে বেরুব।”

নিকোলাই বসে আনাটোল ফ্রাঁস পড়ছিল। ডাশা তার চেয়ারের হাতলের উপর বসে বল্ল: “কাটিয়া সম্বন্ধে দু-একটা কথা আপনাকে বলব।”

“বল।”

“মেয়েদের জীবন বড় দুঃসহ। উনিশ বছরেও তারা ঠিক করতে পারে না, কী করবে।”

“ডাশা, ডাশা, তুমি অত ভেব না। অত ভাবলে তুমি আর বাড়বে না।”

“না, আপনার কাছে কিছু বলে লাভ নেই।” ডাশা ক্ষুণ্ণ হল।

নিকোলাই হেসে বল্ল: “রাগ করলে? কিন্তু কাটিয়ার কথা শুনে কি হবে? আমাদের সম্বন্ধ ত শেষ হয়ে গেছে।”

“উঃ! আমি যদি কাটিয়া হতাম, আমারও আপনাকে ত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এত উদাসীন আপনি?” ডাশা জানালার ধারে উঠে গেল।

“জীবনকে তোমরা সহজ ভাবে নিতে জান না, তোমাদের গোষ্ঠীরই দোষ। জীবন তাই ঘোরালো হয়ে ওঠে, পদে পদে অসন্তোষ দেখা দেয়।” নিকোলাই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো।

ডাশা কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে দেখলো, দু খানা চিঠি এসেছে—একখানা বাবার, অন্য খানা কাটিয়ার।

বাবা লিখেছেন:

“কাটিয়ার চিঠিটা তোমাকে পাঠালাম। এখানে একই রকম চলছে। বড় গরম পড়েছে। সেমিনোভিচকে কারা সে দিন মিউনিসিপাল পার্কে জখম করে গেছে। ও হাঁ, তোমার নামে একটা ছবির কার্ড এসেছিল, কে এক তেলেগিণ পাঠিয়েছে। কোথায় হারিয়ে গেছে কার্ডখানা। সেও বোধ হয় এখন ক্রিমিয়ায়, অন্য কোথাও যদি না গিয়ে থাকে।”

ডাশা শেষের দুটি লাইন অনেক বার পড়লো। বাবার উপর রাগ করলো, কার্ড হারানোর জন্যে। তেলেগিণ এখন ক্রিমিয়ায়, ‘বোধ হয়’ ক্রিমিয়ায়। ডাশা বহুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর কাটিয়ার চিঠি পড়লো:

"মনে আছে ডাম্নশা, আমি একটি লোকের কথা লিখেছিলাম। দিনরাত সে আমাকে অনুসরণ করছে। কাল সন্ধ্যায় লুক্সেমবুর্গ বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একটা বেঞ্চিতে বসেছি, দেখি, ও ওপাশে এসে বসলো। প্রথমটা ভয় করছিল, কিন্তু তবু উঠে পালাইনি। লোকটা আমাকে বল্ল: 'আমি রাতদিন ধরে তোমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি জানি কি তোমার নাম, কোথায় থাক, আর এও জানি আমার সর্বনাশ করেছ তুমি, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি।' আমি লোকটার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম। বল্ল: 'ভয় নেই, আমি বৃদ্ধ, অশক্ত, যে কোনো মুহূর্তে মরে যেতে পারি। কী সর্বনাশ আমার করলে।' দেখলাম, শীর্ণ গালের উপর জল। বল্লাম, 'তুমি আর আমাকে অনুসরণ কোরো না।' চোখ বুজে মাথা নাড়লো। আজ এইমাত্র একটা চিঠি পেয়েছি, সে মারা গেছে। কী ভয়ানক ভাব ত? এখন আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ী চলছে, পথে আলোর মালা, মিহি কুয়াশা জমে উঠেছে চারদিকে। মনে হচ্ছে, জীবন ফেলে এসেছি অনেক পেছনে, যারা আমার আপন ছিল তাদের আমি হারিয়ে এসেছি, আজ আর আমার কিছুই নেই।"

ডাশা নিকোলাইকে চিঠিখানা দেখালো। নিকোলাই দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "কৃত্রিম জীবন, আনন্দের নেশা—এর ফল অবশ্যম্ভাবী নিরাশা। কাটিয়াকে পেয়ে বসেছে আজ সেই ভূত। তোমার আমার, কারো তার হাত থেকে মুক্তি নেই। ঐ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ভাবি: এক রাশিয়া আছে যার মাঠে মাঠে চাষ করছে চাষী, চরছে পশুর দল, খনিতে খনিতে কয়লার স্তর খুঁড়ছে শ্রমিকরা, তাঁত বুনছে তাঁতী, গর্জাচ্ছে হাপর। একদল তাদের ওপর প্রভুত্ব করছে, তাদের শ্রমলভ্যের ওপর ভাগ বসাচ্ছে। তৃতীয় একদল আমরা—বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এই রাশিয়াকে আমরা চিনি না। অথচ সে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা প্রজাপতির দল তারই প্রসাদ-পুষ্ট হয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আজ যদি লাঙল ধরি, কারখানার যন্ত্রের হাতলে হাত লাগাই, সে ত হবে বিলাস, প্রজাপতি আমরা থাকবই। তুমি বলবে—আমাদেরও কাজ আছে। বই লেখা, রাজনীতি চর্চা—এই সব। কিন্তু সেও ত সময় কাটানো ছাড়া কিছুই নয়। কি হবে বই লিখে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বর্ণ-পরিচয় হয়নি? এই নিশ্চিন্ত আলস্যের ফলভোগ করতেই হবে। তাই আমাদের মধ্যে এত অনাচার, এত পাপ! ডাশা, তুমি ঠিকই বলেছ,আমি কাটিয়ার সংগে দেখা করব।"

ঠিক হল, পাসপোর্ট এলেই ওরা প্যারি রওনা হবে। ডিনারের পর নিকোলাই শহরে বেরুল, ডাশা ঘরে চলে এল বাবার কাছে চিঠি লিখতে। চিঠি লেখা শেষ করে শুয়ে পড়লো বিছানায়। গোধূলির নরম আলোয় ঘর ভরে গেছে। দূরে, বহু দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের সংক্ষুব্ধ ধ্বনি।

মনে হল, কে যেন ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চুল সরিয়ে দিচ্ছে কপাল থেকে। উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে মুখে, চুমু, অজস্র চুমু গলে গলে পড়ছে ঠোঁটে, চোখে, চুলে! ডাশা চোখ মেললো। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় দু-একটি তারা, হাওয়ায় উড়ছে চিঠিটা। একটা লোক যেন দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ডাশা উঠে বসলো বিছানায়। বুক ঢাকলো হাতে, জামার ভিতর দিয়ে উপচে পড়েছে স্তন।

"কে?"

"তোমার জন্যে অনেকক্ষণ সমুদ্রের ধারে বসেছিলাম।" লোকটা বেসনভের স্বরে বল্ল, "কেন এলে না তুমি ডাসুশা? ভয় পেয়েছো?"

"হাঁ।"

"আর আমার কেমন করে রাত কেটেছে জানো? আমার শুধু আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ডাসুশা, আমার জন্যে কি একটুও তোমার দয়া নেই?"

ডাশা মাথা নাড়লো, ঠোঁট দুটি কিন্তু বোজা।

"আজ না হোক কাল, বা এক বছর পরে তুমি আমার কাছে আসবে, তোমাকে আসতে হবেই, আমি জানি ডাসুসা, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। কিন্তু তখন হয়ত, একেবারে ফুরিয়ে যাব আমি।" ডাশার কাছে এগিয়ে এলো বেসনভ। তোমার স্মৃতি আমি মুছে ফেলতে পাচ্ছি না · আমার সহধর্মিনী হও তুমি "

ডাশার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ল বেসনভ। থমথমে বীজ-গর্ভ মেঘ জমেছে যেন কুমারী ভূমির ওপর। নাগপাশের মত তার হাত জড়িয়ে ধরেছে ওর দেহ, মুখ এসেছে মুখের সান্নিধ্যে। ডাশা পিছিয়ে গেল সেই বিষাক্ত আলিংগন থেকে। কিন্তু দেহে আর তার এক ফোঁটা শক্তি নেই। হাত পা ভারী। ভাবলো: এই মুহূর্তকেই আমি ভয় করেছিলাম, একেই আবার চেয়েছিলামও কিন্তু এ ত নারীত্বের অপমৃত্যু! মুখ ফিরিয়ে নিলো ডাশা। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বিড়বিড় করে কি বলছে বেসনভ, মুখে মদের গন্ধ। ডাশা ভাবলো: "কাটিয়ার সংগেও এমনি ধারা ..." একটা তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা ওর দেহের ভিতর নামছে, মদের গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠেছে, বেসনভের প্রলাপে গা ঘিন ঘিন করে উঠছে।

"আপনি এখুনি বেরিয়ে যান।" ডাশা তিক্ত হয়ে উঠলো।

বেসনভের মুখে অসুস্থ রক্তপ্রবাহ, চোখ দুটো কয়লার মত জ্বলছে।

ডাশাকে কাছে টেনে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিল। ডাশা মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করছে, কিন্তু বেসনভের হাত থেকে আজ আর অব্যাহতি নেই। বেসনভ তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে তুলে নিলে শূন্যে, বিছানায় নিয়ে চলেছে, আর উপায় নেই!

"না, না," ডাশা একবার শেষ চেষ্টা করলো মুক্তির, স্নায়ুতে-লেগেছে টংকার, দেহ পুড়ে যাচ্ছে। তবু মুক্তি, মুক্তি চাই!

বেসনভ বিক্ষিপ্ত হল চেয়ারের উপর, ডাশা দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

"চলে যাও, এখুনি তুমি চলে যাও।"

বেসনভ একবার ওর দিকে তাকালো, তারপর শ্লথ পায়ে জান্‌লা গলে বেরিয়ে গেল। ডাশা ঘুমোলো না, সারারাত পায়চারি করে কাটালো।

নিকোলাই চায়ের টেবিলে জিজ্ঞাসা করলোঃ "কাল রাতে কি দাঁত কন্‌কন্‌ করছিল ডাশা?"

"না ত?"

"কাল রাতে অত গোলমাল হচ্ছিল কিসেব?"

"জানি না।"

নিকোলাই চলে গেল। ডাশা অস্থির হযে উঠেছে দেহে, মনে। শরীরের ওপর দিয়ে একটা সরীসৃপ চলেছে, ক্লেদাক্ত তার স্পর্শ, মাথার ভেতর আগুন, তরল আগুন! ডাশার মনে হ'ল সেই শাদা ষ্টীমারের কথা। ভলগার উপর দিযে চলেছে, সূর্যের আলো, ঝোপের ভেতর পায়রার অস্ফুট গুঞ্জন। একমাত্র সে-ই তাকে অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে পারে! কিন্তু সে কোথায়? 'বোধ হয়' ক্রিমিয়ায়, তার খুব কাছে, কিন্তু সে ত জানে না।

ডাশা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘৃণ্য সরীসৃপটা এখনও চলছে, চামড়ায় তার স্পর্শ, মাকড়সার অদৃশ্য জালে ঢেকে গেছে ওর মুখ, ওর দেহ, মাথায় আগুন জ্বলছে।

ভোর হল। চারিদিকে গোলমাল, নিকোলাই পাশের ঘরে কি যেন করছে! ডাশা উঠে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লো। শাদা দুধের মত সমুদ্র, ভেজা বালি, জলজ উদ্ভিদের মিষ্টি গন্ধ। ডাশা চলতে লাগলো আপন মনে, পাথরে পাথরে শব্দ উঠছে। একটা গাড়ী আসছে, ধুলো উড়ছে; গাড়োয়ানের পেছনে শাদা পোষাক-পরা আরোহী। ডাশা ভাবলোঃ 'সুখী, লোকটা নিশ্চয়ই সুখী!' মুখ ঘুরিয়ে সে আবার চলতে শুরু করলো।

"ডারিয়া দিমিট্রিভনা!"

কে ডাকছে পেছনে! নির্জন প্রান্তরের ওপর শব্দ তরংগ কেঁপে কেঁপে মিশিয়ে গেল।

ডাশা ফিরে দেখলো, গাড়ী থেকে নেমে তার দিকে এগিয়ে আসছে তেলেগিণ! রোদে-পোড়া, খুসী মানুষটি!...ডাশা ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো, তেলেগিণের শাদা লিনেনের জামা ভিজে গেছে।

"তুমি এতদিন পরে এলে?" ডাশা কাঁপছে তখনও।

"হাঁ, বিদায় নিতে এলাম।" তেলেগিণ ডাশার চুলে হাত বুলিয়ে দিলো, "কালই তোমাকে দেখতে পেয়েছি সমুদ্রের ধারে।"

"বিদায় ?" ডাশা বিস্মিত হল।

"ডাক এসেছে, যেতে হবে। কেন, তুমি কী শোননি ?"

"না।"

"যুদ্ধ বেধেছে জান না।"

ডাশা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। এখনও সে ঠিক বুঝতে পার্চ্ছে না।

তেরো

বিখ্যাত উদার মতাবলম্বী সংবাদপত্র 'দি পিপলস ওযার্ড'-এর অফিসে সাংবাদিকদের বৈঠক বসেছে।

বড় বড় চেয়ার জুড়ে বসেছেন প্রাচীন উদার মতাবলম্বীদল, চুরুটের ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন, ছোকরা সাংবাদিকরা এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসের একমাত্র চামড়ার সেটিটায় বিরুদ্ধদলের প্রতিনিধিরা বসেছেন। ঐ সেটিটা সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত লেখক ইদানীং লিখেছেন, ওটায় নাকি ছারপোকা ভর্তি।"

'পিপল্স ওযার্ড'-এর সম্পাদক চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বল্লেন: "জার শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা চিরদিনই, কিন্তু আজকের এই সংকটে তাঁকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। আজ আমরা ভুলে যাব তাঁর অত্যাচার অনাচারের কথা, বন্ধু ভাবে হাত মেলাবো। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে বর্তমান শাসনতন্ত্রের সমালোচনা আমরা এখন করবো না। এখন যুদ্ধ জিততে হবে, তারপর হবে দোষীর সমালোচনা, বিচার। আপনারা জানেন কি এই মুহূর্তে ক্রাস্নোস্টোভে কি হচ্ছে ? আমাদের সৈন্যরা শত্রুকে রুখতে পার্চ্ছে না, ছত্রভংগ হয়ে পালাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল এখনও সঠিক জানা যায়নি, তবে কীযেভের চারধার ঘিরে ফেলেছে শত্রু। ভেবে দেখুন, কীযেভের যদি পতন হয়। না, না, আমাদের জার-শাসনতন্ত্রের সহযোগিতা করতেই হবে। তারপর শান্তিপর্বে আমরা জানাবো আমাদের অভিযোগ, আমরা চাইবো সংস্কার।"

সম্পাদক-সংঘের বেলোস্ভিয়েটভ চিৎকার করে উঠলো: "জার-শাসনতন্ত্রকে কেন আমরা সাহায্য করব ? কি দিয়েছে সে আমাদের ? আমরা চাই না যুদ্ধ, পৃথিবীর সম্রাটরা একে অন্যের টুটি টিপে ধরুক, তাতে আমাদের কি যায় আসে !"

লিডার-লেখক আলফা তাকে সমর্থন করলো: "ঠিক কথা! আমাদের কি যায় আসে। দ্বিতীয় নিকোলাইকে আমরা সাহায্য করবো না।"

এক সংগে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর:

"যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি ?"

"জার্মান বেয়নেট যখন বুকের উপর চক্‌চক্‌ করে উঠবে তখন বুঝবে।"

"ওঃ, তুমি যে দেখছি জাতীয়তাবাদী !"

"না, আমি শুধু বিদেশী শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত হতে চাই না।"

"তুমি লাঞ্ছিত হবে কেন, লাঞ্ছিত হবে দ্বিতীয় নিকোলাই।"

"জার্মানরা আসুক, বুঝতে পারবে।"

কিছুক্ষণ পরে গোলমাল থামলো। সম্পাদকের স্বর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে: "যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপনারা যা-ই বলুন না কেন, সমস্ত দেশে সাড়া পড়ে গেছে। হাজার হাজার লোক সেনাদলে প্রতিদিন নাম লেখাচ্ছে। মস্কৌ এ জার পেয়েছেন আশাতীত সম্বর্দ্ধনা। যুদ্ধ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে একথা আর অস্বীকার করা যায় না।"

"সম্পাদক মশাই আমাদের সংগে ঠাট্টা-তামাসা করছেন কি-না, আমরা বুঝতে পারছি না।" বেলসভিয়েটভ বল্ল, "তিনি আমাদের এত দিনের মতবাদকে এক ফুঁয়ে তাসের বাড়ির মত উড়িয়ে দিচ্ছেন। বর্তমান শাসনতন্ত্রকে আমরা সাহায্য করব, আপনারাই বলুন—আপনাদের সম্মতি আছে ? রাশিয়ার হাজার হাজার সন্তান সাইবেরিয়ায় এখনো পচছে, এখনো শ্রমিকের বুকের রক্তে রাশিয়ার মাটি ভিজে যাচ্ছে বলুন, তবু আমরা সম্রাটকে সাহায্য করব, পীড়ক শাসনতন্ত্রের হাতে হাত মেলাব ?"

নগ্ন সত্য। নির্যাতিত রাশিয়ার নামে রক্তে চঞ্চলতা জাগে, উত্তেজনা আসে, তবু সবাই বুঝতে পারলো, গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করতেই হবে। পিপল্‌স্‌ ওয়ার্ডের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রুফ আসতেই বেলসভিয়েটভ দেখলো লেখা আছে, "মতদ্বৈধ ভুলে আমাদের এক হতে হবে।" কাল বড় বড় হরফে কাগজের শিরোনামায় থাকবে: "মাতৃভূমির বিপদ। অস্ত্র ধর।" সংবাদপত্র-বিক্রেতারা চিৎকার করবে।

যুদ্ধ! যুদ্ধ! চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে য়ুরোপের রং বদলে গেল। পথে পথে অস্ত্রধারী সৈন্যদলের গর্বিত পদক্ষেপ, হাওয়ায় বারুদের গন্ধ। মানুষ আবিষ্কার করেছে বই, ইলেকট্রিসিটি, রেডিয়াম, কিন্তু সময় এলে তার কড়া ইস্ত্রি-করা কামিজের নীচে একটা লোমশ আদিম জন্তু জেগে ওঠে।

বৈঠক শেষ হল, ছোকরারা বার্তা-সম্পাদকের ঘরে জটলা করছে, প্রাচীনরা লাঞ্চ খেতে গেল। আনটোসকা আর্নল্ডভ উঠলো, তাকে যেতে হবে মিলিটারী সেন্‌সর অফিসে।

"আশা করি, আপনি আমাকে এই কটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন ?"—আর্নল্ডভ প্রেস অফিসার কর্নেল সল্‌নট্‌সেভকে বললো। দেয়ালে জার নিকোলাই প্রথমের প্রকাণ্ড ছবি। তার মনে হল নিকোলাই প্রথমের চোখ দুটি প্রেস—অফিসারের মুখের

ওপর নিবদ্ধ, বিদ্রূপ আর ঘৃণার ছায়া সেখানে। যেন বলছে, খাটো কুর্তা গায়ে, হলদে রং-এর জুতো পায়ে কুকুরের বাচ্চা!—"নতুন বছরে আমাদের সৈন্যরা কি বার্লিনে পৌঁছুতে পারবে?"

কর্নেল মৃদুস্বরে বল্লেন:

"বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। নতুন বছরে আমাদের সৈন্য বার্লিনে পৌঁছুবে এ কল্পনায় মাদকতা থাকতে পারে, কিন্তু সত্যিই সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে কিনা কে জানে। আমার মনে হয়, এখন সংবাদপত্রের কর্তব্য হচ্ছে, দেশের বিপদের কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া।"

আর্নল্ড অবাক হয়ে গেল। কর্নেল আবার বলতে শুরু করলেন:

"জার্মানরা আমাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাদের কামান আছে, রেলপথে জিনিষপত্র সরবরাহের সুবিধেও তাদের অনেক। তবুও সীমান্ত তারা পার হতে না পারে, সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। কিন্তু এখানে আর একটা দিক আছে। সীমান্তের অধিবাসীদেরও জার্মানদের রুখবার জন্যে সৈন্যদের সংগে মিলিত হতে হবে। জানি"—কর্নেলের স্বর মৃদু হয়ে এল—"জানি, অমানুষিক অত্যাচার অনাচারে তারা বর্তমান শাসনব্যবস্থার বিদ্রোহী, তবু তাদের মিলতে হবে তারই সংগে, নইলে দেশের অন্য উপায় নেই। সৈন্যদলে আজ চাই রাশিয়ার সুস্থ সবল সন্তানদের, মেয়েদের চাই হাসপাতালের কাজে।"

"হাসপাতালে আহতের সংখ্যা কত?" আর্নল্ড জিজ্ঞেস করলো।

"সংখ্যা আড়াইশ থেকে এ সপ্তাহে তিন হাজারে দাঁড়িয়েছে।"

"মৃত?"

"অসংখ্য, সরকারী হিসেব অবশ্য একটা আছে।" কর্নেল উঠলেন। আর্নল্ড বেরুতে যাবে এমন সময় সাংবাদিক আটলাণ্টের সংগে দেখা। সে ঢুকছে। যেতে যেতে সে শুনতে পেল আটলাণ্ট বলছে:

"কবে, কবে আমরা বার্লিন নেব?"

বাইরে প্রশস্ত পার্কে চাষাদের ড্রিল করানো হচ্ছে। 'হল্ট' 'এটেনশন' 'এই কুকুরের বাচ্চা, সিধে হয়ে দাঁড়াতে শিখিসনি!'—একটা মোটা সার্জেণ্ট মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে।

দুশ বছর আগে এদের পূর্বপুরুষেরা এখানে এসেছিল এই শহর গড়তে, শাবলের ঘায়ে বন্ধুর ভূমি স্বীকার করেছিল বশ্যতা, স্বেদজল ঝরেছিল, আকাশ ছাড়িয়ে উঠেছিল রাজশক্তির বিরাট স্তম্ভ। আজ তাদের সন্তানরা আবার এসে জুটেছে, এবার শহর গড়তে নয়, বিরাট স্তম্ভের ভিত কেঁপে উঠেছে, তাকে ঠেক্‌না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে।

নেভস্কির পথে তদল সৈন্য চলেছে। তাদের কাঁধে ব্যাগ, মেস-টিন, বাজনার তালে তালে মার্চ করে চলেছে। কি ক্লান্তি ওদের মুখে, বুট ধূলোয় ভরে গেছে! একজন বেঁটে সামরিক কর্মচারী তাদের সমুখে। 'রাইট! রাইট! রাইট!' একটা গাড়ী পেছনে আসছে, ঘোড়ার মুখে ফেনা উঠছে। একটি সম্রান্ত মহিলা গাড়ী থেকে মুখ বার করে ওদের দিকে চেয়ে আছেন।

জার্মান রাজদূতের বাড়ির সমুখে বিরাট জনতা। ভেতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরুচ্ছে ধোঁয়া। ভাঙা জান্‌লা দিয়ে কারা জনতার মধ্যে একরাশ কাগজ ছড়িয়ে দিল। হাওয়ায় কাগজগুলো উড়ছে; জনতার হর্ষধ্বনি। তীক্ষ্ণ হাতুড়ীর শব্দ শোনা যাচ্ছে, ধাতব ঝংকার উঠছে। ফটকের ব্রোঞ্জ মূর্তিটা কারা যেন ভেঙে ফেললো। একটি মহিলা আর্নল্ডভকে বল্ল, "এমনি করে আমরা ওদের চূর্ণ করব।" ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা, অশ্বারোহী পুলিস; জনতার চিৎকার!

রাতে আর্নল্ডভ লিখল:

"জনতার ক্রোধের নমুনা আজ আমরা পেয়েছি। পানোন্মত্ত হল্লা নয়, দেশের শত্রুর প্রতি ঘৃণায়, বিদ্বেষে তারা ফুঁসে উঠেছে। জার্মানরা ভেবেছিল, ঘুমন্ত রাশিয়াকে তারা এক তুড়িতে জয় করে নেবে, কিন্তু শুধু একটি কথা তাকে জাগিয়ে তুলেছে: 'বিপদ, মাতৃভূমির বিপদ!' জার্মানের গোলার শব্দে ঘুম ভেঙেছে রাশিয়ার, সে জেগেছে, শত্রু সাবধান!"

সম্পাদক সেই দিনই তাকে বল্লেন: "তুমি কয়েকদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে এস। আমরা জানতে চাই, মুঝিকা এই যুদ্ধ কি ভাবে গ্রহণ করেছে। কাগজের পক্ষে একটা জবর খবর হবে। আজকাল বুদ্ধিজীবীরা শুধু মুঝিকদের সম্বন্ধেই জানতে চায়।"

আর্নল্ডভ পরদিনই রওনা হল।

ছোট্ট গ্রাম খিলবা। এলিজাবেথা এখানে বেড়াতে এসেছে তার ভাইয়ের কাছে। আর্নল্ডভ সন্ধ্যায় এসে পৌছুলো খিলবায়। মড়ার মত নিঃসাড় গ্রাম। মাঝে মাঝে দু একটা মোরগের চিৎকার, নদীতে মেয়েদের কাপড় কাচার শব্দ।... গাড়ি এসে থামলো বাড়ির সামনে। আর্নল্ডভ মুখ বাড়িয়ে দেখলো, এলিজাবেথা আর তার ভাই দাঁড়িয়ে আছে। কানে আসছে দু-একটা কথা:

"লিজা, নিরুদ্ধ জীবন তোমাকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে। তোমরাই হচ্ছ বুর্জোয়া সংস্কৃতির শেষ তলানি।"

লিজা হেসে উঠলো: "বই মুখস্ত-করা কথা শুনতে আমি চাই না। তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তুমি এসেছো আমাকে নিরুদ্ধ জীবনের কথা শোনাতে?"

"লিজা।"

এলিজা চমকে তাকিয়ে দেখলো, আর্নল্ড পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আর্নল্ড তুমি।" এলিজা বিস্মিত হল।

"খবরের কাগজের কাজে আসতে হল। সম্পাদক মশাই খিলবার লোকদের যুদ্ধ সম্বন্ধে মতামত জানতে আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"খিলবার লোকের মতামত।" কাইকিয়েভিচ জিজ্ঞেস করলো।

"হাঁ।"

"কে জানে ওরা কী ভাবছে।" মুখে ত কোনো রা' নেই।"

"সৈন্য দলে নাম লেখাচ্ছে?"

"হাঁ, অনেকেই।"

"ওরা জানে না, জার্মানরা ওদের শত্রু?"

"না, ওরা জানে না, জানতেও চায় না।"

"তবে?"

"জেনে কী লাভ? ওরা যা চাইছিল, তা ত হাতে পেয়েছে। বন্দুক হাতে পেলে লোকের চরিত্র বদলে যায়। বেঁচে থাকলে শীগগিরই আমরা দেখতে পাব, কাদের বিরুদ্ধে তারা বন্দুক তুলেছে।" কিযেভিচ হাসলো।

"যুদ্ধের কথা ওরা কখনও বলে না?"

"গ্রামে গিয়ে নিজেই শুনে এস না।"

আর্নল্ড আর এলিজাবেথ গ্রাম দেখতে বার হল। সন্ধ্যার অন্ধকার জমে উঠেছে। অনেক বাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি পড়ে আছে, কোথাও যেন একটা ঘোড়া শব্দ করে জল খাচ্ছে, একটা কাঠের বাড়ির সমুখে তিনটি মেয়ে গান গাইছে:

"খিলবা, আমার সোনার খিলবা—
কী নেই তোমার?"

নিস্তব্ধতার বুকে ছড়িয়ে পড়ছে সুরের রেশ। আর্নল্ড ও এলিজাবেথা তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

"চল আমরা ঘরে যাই," ওদের মধ্যে একটি মেয়ে বল্ল, আর দুটি ঠাঁয় বসে রইলো। তারা গানের কলিটা ভাঁজছে ... 'আমার আমার ...'

"আহা, নাইটিংগেলদের বসে বসে আর গান গাইতে হবে না।" দরজাটা দড়াম করে খুলে এক বুড়ো বেরিয়ে এলো।

"আমরা গান গাইছি ত তোমার কি?"

"বটে! এখনও চাবুক পড়েনি বুঝি। দুপুর রাতে গান গাইছ!"

"তুমি চ্যাচাচ্ছ কেন? গাইব না ত কি করবো?" মেয়েটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো।

"সত্যিই দেশে আর মানুষ রইলো না।" বুড়ো বসে পড়লো, 'কসমো ডামিনস্কের একটি মেয়ে' বলছিলো—ওদের ওখানকার সবাই যুদ্ধে চলে গেছে। এর পর তোদের পালা।"

"ওমা, আমাদের নিয়ে গিয়ে কি করবে?"

"সৈন্যদলে ভর্তি করবে।"

"আচ্ছা, কাকা, আমাদের জার কাদের সংগে যুদ্ধ করছেন?"

"আর একজন জারের সংগে।"

"সে জার কোথায় থাকেন?"

"সমুদ্রের ধারে।"

"কি যা-তা বকছ!" অন্ধকারের ভেতর থেকে কার স্বর শোনা গেল!

"জার কোথায়! জার্মানীর সংগে আমরা লড়ছি।"

"হাঁ, হাঁ, তাই হবে।" বুড়ো গম্ভীর স্বরে বল্ল।

আর্নল্ডভ এবার এগিয়ে এসে বুড়োকে জিজ্ঞেস করলো, "যারা যুদ্ধে গেছে, তারা কি ইচ্ছে করে গেছে?"

বুড়ো আর্নল্ডভের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর বল্ল: "ইচ্ছে করেই গেছে। মরার ভয় করে কি হবে?" এখানেও ত খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরত। জিনিস-পত্র যা আক্রা; ওদিকে মজুরীও তো কম, কোনোরকমে তো সবাই বেঁচে আছে। যুদ্ধে শুনেছি ভালো খেতে পরতে দেয়। দুদিন অন্তর মাংস, চা, চিনি, তামাক—যত ইচ্ছে চুরুট টানা যায়, বুড়ো নয় হলে আমিও চলে যেতাম।"

"কিন্তু যুদ্ধ বড় ভয়ানক—নয় কি?" আর্নল্ডভ জিজ্ঞেস করলো।

"কর্তা, সে ত ঠিক কথা! কিন্তু ভালো খেতে পরতে পাওয়া—সে কি কম কথা!"

চৌদ্দ

ত্রিপল-ঢাকা রসদ-বোঝাই গাড়ির সার চলেছে কাদার উপর দিয়ে। বৃষ্টি পড়ছে, এখানে-ওখানে পথের পাশে মরা ঘোড়া, ওলটানো গাড়ি। মাঝে মাঝে দু-একটা মিলিটারী গাড়ী দেখা দিচ্ছে। চিৎকার উঠছে, কটূক্তি বর্ষিত হচ্ছে, তারপর আবার সেই একঘেয়ে চাকার শব্দ।

গাড়ির সারের শেষে রাইফেলধারী সৈন্যদল, তাদের পেছনে আবার পদস্থ কর্মচারীদের গাড়ি, এমবুলেন্সের সার।

টিমিয়ে টিমিয়ে চলেছে গাড়ির সার। দূরে সরে যাচ্ছে পরিত্যক্ত গোলাবাড়ি, রিক্ত প্রান্তর! ভাঙা-চোরা স্তূপের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে দু-একটা

কারখানার চিমনি, একটা দেয়াল কামানের গোলায় ভেঙে গেছে, শুধু একটু অবশিষ্ট আছে, তারই ওপর একটা সিনেমার পোস্টার—দাঁত বার করে একটা মেয়ে হাসছে। একটা গাড়ীর চাকা দুটো নেই, একজন আহত লোক সেখানে শুয়ে গোঙাচ্ছে। বিশ মাইল দূর থেকে আসছে কামানের শব্দ। গাড়ীর গন্তব্যস্থান সেখানে। সারা রাশিয়া থেকে চলেছে রসদ আর মানুষ। কামানের গর্জনে জাগছে সবাই, জাগছে মুঝিক, জাগছে বিলাসী বুদ্ধিজীবীর দল।

মুঝিকরা জানে না, কার সংগে তারা যুদ্ধ করতে চলেছে, কিসের জন্য এই যুদ্ধ—কি হবে জেনে? জীবনের তিক্ততা, ঘৃণা অনেক দিন থেকেই তাদের চোখের ওপর রক্ত-কুয়াশার সৃষ্টি করেছিল, আজ তারা তাদের পথের সন্ধান পেয়েছে। সময় এসেছে, ভয়ংকর কিছু করতে হবে তাদের। তারা শিস দিচ্ছে, গাইছে অশ্লীল সংগীত—যুগার্জিত বশ্যতা দূরে ফেলে এসেছে। মনে পড়ছে না মায়ের স্নেহ, প্রিয়ার মুখ। রাশিয়া, নিস্তরংগ রাশিয়া, উদ্দাম হয়ে উঠেছে, ঢেউ এসেছে, ঢেউয়ের পর ঢেউ।

যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানায় এসে পৌঁছুল তারা। গাড়ীর সার আর দেখা যায় না, সৈন্যদল ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ গান গাইছে না, শিস দিচ্ছে না, জীবন নিভে গেছে এখানে। প্রান্তরে ছোটো ছোটো খাত—এই সৈনিকদের বাসস্থান। এখানে তারা ঘুমোবে, খাবে, উকুন বাছবে, রাইফেল থেকে নিঃশেষিত গুলি ফেলে দেবে।

অন্ধকার হয়ে এল। দিগন্ত-রেখায় হাউইয়ের আলো মাঝে মাঝে ঝলকায়, তারপর আকাশের বুকে দাগ কেটে তারাদের মাঝে মিলিয়ে যায় একটা গোলা চলে গেল মাথায় উপর দিয়ে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, আগুন, ঝাঁঝালো বারুদের গন্ধ। মাঝরাত্রে সংকেত ধ্বনি উঠলো: শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। খাত থেকে ঘুম চোখে উঠে এলো সৈনিকদল। তারপর ছুটে চললো রিক্ত কদমাক্ত প্রান্তরের ওপর দিয়ে। রাত্রির নীরবতা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তাদের চিৎকারে, গুলির শব্দে।

পরদিন কেউ মনে করতে পারলো না, কি হয়েছিল রাতে! এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন, সকালের আলোয় ধুয়ে মুছে গেছে। কেউ কেউ নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে গিয়ে কল্পনার সাহায্য নিলে—কারো বুকে সংগীন বিঁধেছে, মগজের ঘি বেরিয়ে পড়েছে কারো, গরম রক্ত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে মুখে—চারিদিকে ধোঁয়া আর অন্ধকার!

নৈশ অভিযানের স্মৃতি পড়ে আছে চারদিকে। শত্রুর মৃতদেহ, তামাক, কম্বল, কফির টিন।

সকালে আবার শুরু দৈনন্দিন জীবন। উকুন বাছা, চুরুটের ধোঁয়ার সংগে সংগে মেয়েদের সম্বন্ধে অশ্লীল গল্প, ঘুম।

তেলেগিণ এ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধুলো আর স্যাঁতসেঁতে মাটি, সপ্তাহ থেকে সপ্তাহ একই পোষাক-পরা—ওকে আর পীড়া দেয় না। যে সৈন্যদলের সে কর্মচারী, তার অর্ধেক যুদ্ধে নিহত হয়েছে। নতুন সেনা এসে তাদের সংগে যোগ দেয় নি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তারা উকুন বাছছে, ট্রেঞ্চে ঘুমোচ্ছে আর উদগ্রীব হয়ে আছে, কখন তাদের ফিরবার হুকুম আসবে।

কিন্তু হাই-কমাণ্ডের ইচ্ছা অন্যরকম। শীতের আগেই হাংগেরী ধ্বংস করতে হবে। এখানে নতুন সেনা পাঠানো নিষ্প্রয়োজন। তিন মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদল যখন ক্লান্ত, ছত্রভংগ হয়ে পড়বে, তখন রুশ সৈন্যবাহিনীর বামভাগ তাদের আক্রমণ করবে। ক্রাকৌ, ভিয়েনা অধিকৃত হবে, তারপর বার্লিন।

রুশ সেনাবাহিনী এই পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হাজার বন্দী, রসদ, অস্ত্র, পোষাক—দিনের পর দিন তাদের হস্তগত হচ্ছে। প্রাচীন যুদ্ধ-প্রথা অনুসারে এই যুদ্ধ কবে শেষ হয়ে যেত! কিন্তু সাফল্যের পর সাফল্যে রণোন্মাদনা যেন বেড়ে চলেছে। ঘৃণা দেখা দিয়েছে দ্বিগুণিত হয়ে, শত্রু ছত্রভংগ হয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন শত্রু গজিয়ে উঠছে মাটি ফুঁড়ে, চারদিকে মৃত্যু, ধ্বংস। অতীতের দুর্ধর্ষ তাতার, মদগর্বী পারসিকরা এ যুদ্ধের কথা কল্পনায়ও আনতে পারত না। দুর্বল শত্রু, কৌশলী মুঝিক প্রতিদিন যুদ্ধক্ষেত্রে আহুতি দিচ্ছে বোবা পশুর মত—তাদের প্রভুদের মারণযজ্ঞে। যুদ্ধ শেষ হলে এই উন্মাদনা নিভবে কিনা কে জানে।

তেলেগিণদের ধ্বংস-প্রায় দল একটা মরা নদীর ধারে এসে পৌঁছেছে। চারদিকে এতটুকু আড়াল নেই, ন্যাড়া প্রান্তর। ট্রেঞ্চগুলো অগভীর। ওরা হাই-কমাণ্ডের আদেশের অপেক্ষা করছে—হয় মরণের মুখে এগিয়ে যাবে, নয়ত পেছু ফেরা। ইতিমধ্যে ওরা ঘুমিয়ে নিচ্ছে, বুট আর গুলির পেটি খুলে ফেলেছে; একটু বিশ্রাম। নদীর ওপারে কোথায় যেন চলেছে যুদ্ধ।

ছ'মাইল দূরে এক পুরোনো প্রাসাদে প্রধান সেনানিবাস। তেলেগিণ বিকেলে তারই উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো।

নদ এঁকে-বেঁকে চলেছে ঝোপ ঝাড় আর শরবনের ভেতর দিয়ে, মৃদু কুয়াশায় ছেয়ে গেছে চারদিক; বাতাস ভিজে; মাঝে মাঝে এক একটা কামানের না ফাটা গোলা গড়িয়ে চলেছে নদীর ঢালু পার বেয়ে।

তেলেগিণ একটা সিগারেট ধরালো। কুয়াশা; নিষ্পত্র গাছ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। জলাভূমি দুধের মত শাদা। একটা গুলি মাথার উপর দিয়ে শিস দিয়ে চলে গেল। তেলেগিণ মাথা নীচু করলো। নির্জন কাঁকর-ছড়ানো পথ—ভূতের মত গাছগুলো, মন্ত্রমুগ্ধ পৃথিবী, প্রেমার্ত হৃদয় ...

এমন সময়ে ডাশা তার কাছে আসে। সে অনুভব করে তার স্পর্শ। লৌহ চিৎকারে গোলা ফেটে যায়, রাইফেল ঘ্যান ঘ্যান করে ওঠে, চিৎকার, শপথ ধ্বনি—তবু এরই মাঝে তার স্পর্শ অনুভূত হয়। মৃত্যু যদি আসে, আসুক না। সে কি পারবে জীবনের এই পরম ধন—তার প্রেমকে ছিনিয়ে নিতে ?

ইউপেটরিয়া, নির্জন পথ, দূরে স্তনিত সমুদ্র। ডাশার চোখে জল, তেলেগিণের বুকে তার মুখ, "তেলেগিণ, প্রিয়, তোমার জন্যে—" অকথিত কথা ঝরে পড়লো।

তেলেগিণের জীবনে নতুন পাতার সূচনা। তার কানে কানে সে বল্ল। 'ভালোবাসি, ভালোবাসি।'

সে এখন ভাবে, সে কি বলেছিল সে কথা, না, চিন্তা করেছিল মনে মনে। ডাশা মাথা নত করে বল্ল : "চল।'

জলের ধারে গিয়ে ওরা বসলো ভিজে বালির উপর। ডাশা ছোটো ছোটো নুড়ি ছুঁড়লো সাগরের জলে।

"আমি তোমাকে কতগুলো কথা বলব, তার পরেও আমাকে তুমি ভালোবাসবে কি না এই প্রশ্নই আমাকে আকুল করে তুলেছে।'

ডাশা আড়চোখে দেখলো তেলেগিণের মুখে ম্লানিমা।—,

"ইচ্ছে হয় ভালোবেসো—না হয় চলে যাও—আমার কাছে দুই-ই সমান।" চোখ তার জলে ভরে গেছে। জল মুছে আবার বল্ল, "কুৎসিত জীবন আমি কাটিয়েছি —'

তারপর পিটাসবুর্গের সেই উন্মত্ত রাত, সামারার একঘেয়ে জীবন, বেসনভের পংকিল স্পর্শ, রক্তে আগুন

ডাশা বালির উপর শুয়ে পড়েছে, মুখের উপর পড়েছে চাঁদের আলো। তেলেগিণ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সমুদ্রের পানে। শান্ত তার হৃদয়, এতটুকু তরংগ-বিক্ষোভ নেই সেখানে। তাকিয়ে দেখলো, ডাশা ঘুমিয়ে গেছে।

বিদায়ের ক্ষণ। নির্জন সমুদ্রতীর।

"তেলেগিণ।" ডাশা নীরবতা ভাঙলো।

"বলো।"

"আমাকে ভালোবাসো এখনো ?"

"হাঁ।"

ডাশা ওর হাতে হাত রেখেছে।

"কবে যাবে ?"

"কাল ভোরে।"

ডাশাকে কাছে টেনে আনলো তেলেগিণ, মুখে চোখে অশ্রান্ত চুম্বন; নিশ্বাস রুদ্ধ, সুন্দর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে ইন্দ্রিয়ে। নতুন জীবন জাগবে।

"থামো!" একটা কর্কশ স্বর বেজে উঠলো নিস্তব্ধতার কন্দরে কন্দরে।

"বন্ধু, বন্ধু!" তেলেগিণ চেঁচিয়ে উঠলো। সেনানিবাসে সে এসে পড়েছে।

আগুনের ধারে বসে আছেন লেফ্‌টেনাণ্ট প্রিন্স বিয়েলস্কি আর তার সহকারী মার্টিনভ। তেলেগিণ একটা টোটাব টিন টেনে নিয়ে বসলো তাদের পাশে।

"এখনও গুলি চলছে তোমাদের ওদিকে?" মার্টিনভ জিজ্ঞাসা করলো।

তেলেগিণ মাথা নাড়লো। প্রিন্স হাত সেঁকতে-সেঁকতে বল্লেন: "মৃত্যুর জন্যে কে ভয় করে? কিন্তু এই গন্ধ আর সহ্য হয় না, চারদিকে কি গন্ধ উঠছে দেখেছ!"

"চুলোয় যাক গন্ধ!" মার্টিনভ বল্ল, "একটা মেয়েমানুষ নেই, এক ফোঁটা ভড়কা নেই—এর নাম যুদ্ধ?" মার্টিনভ একটা কাঠের উপব বুটের ঠোক্কর মারলো।

ডাক এসেছে। সবাই ভিড় করেছে উঠোনে। ডাকগাড়ীব চালক চিৎকার করছে: "একটু সবুর কর, টানাটানি কোরো না।"

নোংরা, ভেজা ক্যানভাসেব থলেগুলো হলে খোলা হল। দুশ্চিন্তা, ভালোবাসা, ফেলে-আসা জীবনেব স্পর্শ দোলা দিয়ে যায় খাকির নীচে, বুক টনটন করে ব্যথায়।

"নেজনি, নেজনিব নামে দুখানা চিঠি এসেছে।" স্টাফ-ক্যাপটেন চিৎকার করছে।

"নেজনি বেঁচে নেই।" কে যেন বল্ল।

"কবে?"

"আজ ভোরে।"

তেলেগিণের ছ'খানা চিঠি এসেছে, ছ'খানাই লিখেছে—ডাশা। বাগানে আদম আব ইভের মূর্তিটার নীচে দাঁড়িয়ে সে এক নিশ্বাসে সব ক'খানা চিঠি পড়ে ফেললো।

আর্দালী এসে খবর দিল ফোন এসেছে, তাকে এখুনি যেতে হবে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্নেলের ওখানে।

কুয়াশা আরো ঘন হয়ে এসেছে, কিছুই দেখা যায় না; ঘন, নরম দুধের মত শাদা কুয়াশা। তেলেগিণ একবার শার্টের পকেটে অনুভব করলো ডাশার চিঠি। "আমি তোমাকে ভালোবাসি, একমাত্র তোমাকেই—" কানে বাজছে নদীর শব্দ। তেলেগিণ এগিয়ে চললো। আরো স্পষ্ট হয়ে এসেছে শব্দ। হঠাৎ সে যেন শূন্যে পা বাড়ালো। মাটি ধ্বসে গেছে, সে পড়ছে, মহাশূন্য থেকে পড়ছে…

এই সেই ভগ্ন-সেতু মুখ, এরই ওপারে শত্রু। জলে শব্দ হতেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগলো নদীর জলে, একটা মেসিনগান গর্জে উঠলো। তেলেগিণ নদীর ধারের শরবন আর ঝোপের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলতে লাগলো। গুলির

শব্দ কমে থেমে এসেছে। তেলেগিণ টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছলো। যাক, এ যাত্রা সে রক্ষা পেয়েছে। ডাশার চিঠি ভালো করে পড়বে।

"চমৎকার ছেলে, বুঝলে ভ্যাসিলি?" কে যেন বলছে।

"দাড়াও, একটা শব্দ শুনতে পেলাম।"

"কে?"

"বন্ধু, বন্ধু।" তেলেগিণ সমুখেই একটা ট্রেঞ্চের ভেতরে দুটি দাড়িওলা মুখ দেখতে পেল।

কর্নেল রোজানভ তাকে দেখেই বলে উঠলেন: "এসেছ তুমি?"

"কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।" তেলেগিণ বল্ল।

'শোন, ওপরওলাদের কাছ থেকে হুকুম এসেছে, নদী পেরোতে হবে। আমি একটা ফন্দী ঠাউরেছি, .. একটা পোল তৈরী করতে হবে, তারপর সত্তরজনকে নামিয়ে দেব ওপারে। তুমি কি বল?"

তেলেগিণ বাইরে এল কিছুক্ষণ পরে। ট্রেঞ্চের ভেতরে তখনো অস্ফুটস্বরে কথাবার্তা চলছে:

"কখন এই যুদ্ধ শেষ হবে?"

"শেষ একদিন হবেই কিন্তু আমরা দেখব না।"

"ওঃ, ভিয়েনাটাও যদি আমরা নিতে পারতাম।"

"হঠাৎ ভিয়েনার ওপর এত ঝোক?'

"শুনেছি চমৎকার শহর।"

"বসন্তেও যদি যুদ্ধ শেষ না হয়, সবাই পালাবে। মাঠে চাষ করবে কারা?"

"সেনাপতিরা যুদ্ধ থামাবে কেন?"

"ঠিক বলেছ। ওরা যুদ্ধ থামাবে না। মোটা মাইনে পাচ্ছে, আর হুকুম চালাচ্ছে। মরছি ত আমরা।"

"সয়তানের দল, কামানের মুখে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে।"

তেলেগিণের বুক ঠেলে উঠলো একটা দীর্ঘশ্বাস।

পনেরো

পোল তৈরী হচ্ছে।

চাঁদের ঝাপসা আলোয় কুয়াশার আড়ালে সারি সারি লোক। ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে:

"তৈরী।"

"হাঁ, এবার কাঠগুলো নামাতে হবে।"

"ওপার পর্যন্ত যাবে ত ?"

"এই—আস্তে নামাও।"

"বড্ড ভারী … "

"থামো, থামো, থামো।"

তক্তার একধার জলে পড়লো। প্রচণ্ড শব্দ, ছিটে উঠলো জল। তেলেগিণ হেঁকে হুকুম দিল :

"শুয়ে পড সবাই।"

লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর সবাই শুযে পড়লো। কুয়াশা পাতলা হয়ে এসেছে, আকাশে ভোরের আভাস। ওপারে সব চুপচাপ।

তেলেগিণ ডাকলো ! 'জুবৎসব।'

"এই যে।"

"যাও, ভাল করে আটকে দাও।" জুবৎসবের দীর্ঘদেহ অদৃশ্য হযে গেল কুয়াশায়, জলের ছপছপ শব্দ উঠছে।

"বড্ড পেছল !" জুবৎসব নিচ থেকে বল্ল,"আরও খানকয়েক তক্তা ফেলে দাও নিচে।"

পোলের নিচে জল এবার কলকল ছলছল করছে, অস্পষ্ট অন্ধকারে সরু ফিতের মত পোলটা ওপার পর্যন্ত ছড়িযে পড়েছে। ওপারে নিস্পন্দ ঝোপঝাড, তারই পেছনে শত্রু। তেলেগিণ একবার চারদিকে তাকিয়ে হুকুম দিল : "ওঠ !"

কুয়াসার ভেতর থেকে গজে উঠলো সেনাদল। একজন একজন করে দৌড়ে পার হতে হবে।

তেলেগিণ একবার পোলটার দিকে তাকালো। ওকি ! একটা তীক্ষ্ণ রশ্মি কুয়াশা ভেদ করে এসে পড়েছে পোলের সরু হলদে তক্তার ওপর। শত্রুরা সন্ধানী আলো ফেলেছে। তেলেগিণ দ্রুতপদে পোলের ওপর নেমে এল। আলো পড়ছে তার মুখে, ওপারের ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে গর্জে উঠছে রাইফেল আর মেসিনগান। তেলেগিণ ওপারে এসে পৌঁছেছে। একবার পেছন ফিরে দেখলো। তার পেছনে আসছে দীর্ঘদেহ এক সৈনিক, মুখ দেখা যায় না। ওকি, পড়ে গেল ? নদীর জলে শব্দ হল ছলাৎ।

মেসিনগান গর্জন করছে।

ওর পাশে এসে কে বসেছে, স্নসভ ? তারপর আর একজন, আর একজন, শেল ফাটছে তাদের সমুখে। ধোঁয়ায়, বারুদের গন্ধে, আর্তনাদে চারদিকে নরকের বীভৎসতা।

ওরা বুকে হেঁটে চলেছে, সমুখে কাঁটাতারের বেড়া। জুবৎসব তার কেটে দিল। লাপটেভ নিঃশব্দে শত্রু ট্রেঞ্চের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল।

"বোমা! বোমা ছোড!" জুবৎসব চেঁচিয়ে উঠলো।

লাপটেভ তবুও নীরব। জুবৎসব আবার চিৎকার করলো, "এই শালা কুকুরের বাচ্চা!" রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতো মারলো। লাপটেভ ফিরে তাকালো, তারপর শুয়ে পড়ে একটা হাত-বোমা ছুঁড়ে মারলো ট্রেঞ্চের মধ্যে।

জুবৎসবের চিৎকার শোনা যাচ্ছে: "ঝাঁপিয়ে পড, লাফিয়ে পড ভাই সব।"

দশজন লোক নিঃশব্দে শত্রু ট্রেঞ্চের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। উঠল বিস্ফোরণের শব্দ।

তেলেগিণ ট্রেঞ্চের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। নরম একটা স্পর্শ জুতোর তলায়। তাকিয়ে দেখলো একটা লোক বসে বসে বিড বিড করে বকছে, মুখখানা শাদা, মুখোসের মত শাদা। তেলেগিণ চোখের জল চেপে তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে।

যুদ্ধ থেমে গেছে। হতাবশিষ্ট শত্রু ট্রেঞ্চ থেকে উঠে এসেছে। তাদের হাতে রাইফেল নেই, মুখে বারুদের কলংক। ট্রেঞ্চের ওপাশে মেসিনগানটা এখনও শব্দ করছে। তেলেগিণ অন্ধকারের আড়ালে নিঃশব্দে মেসিনগানের পেছনে গিয়ে দাড়ালো। একটা আবছা ছায়া ঝুঁকে পড়েছে কামানের উপর। তেলেগিণ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ঘাড়ে। শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। জুবৎসব পেছন থেকে বল্ল, "আমি ওকে সায়েস্তা করছি!" রাইফেলের বাট দিয়ে মাথার ওপর কয়েক ঘা লাগাতেই লোকটা তেলেগিণের কোলের উপরে ঢলে পড়লো।

তেলেগিণ ওকে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাড়ালো।

"দেখেছেন, ওকে কামানের সংগে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে।"

বৃষ্টি শুরু হয়েছে, "হলদে মাটির উপর রক্ত জমেছে, তার উপর বৃষ্টিধারা। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে বালির বস্তার মত মৃতদেহ, দু-একটা হাভারস্যাক, টিন। সৈনিকরা শুয়ে শুয়ে রুটি চিবুচ্ছে আর গল্প করছে। দূরে জর্মান লাইন থেকে ক্ষীণ বন্দুকের শব্দ আসছে। রাত গাঢ় হয়ে এল বিক্ত প্রান্তরে। সৈনিকরা এবার ঘুমিয়ে পড়বে। তেলেগিণ একটা গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল। নরম শ্যাওলা ওর পিঠে লাগছে, দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ছে কলারের উপর। একটা দিন কেটেছে বটে আজ! ভোরের উত্তেজনা এখন আর নেই। এখন ক্লান্তি। কে যেন আসছে, জুবৎসব!

"একখানা বিস্কুট খাবেন?"

"দাও"

মুখে গলে গেল বিস্কুটখানা। জুবৎসব ওর পাশে শুয়ে পড়েছে।

"একটু তামাক খেতে পারি?"

"খাও, কিন্তু সাবধানে।"

"পাইপ আছে।"

"জুবৎসব, লোকটাকে কিন্তু মারবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।"

"কে, মেসিন-গানার ?"

"হুঁ।"

"সত্যি। ওকে মেরে কি লাভ হল।"

"ঘুমোবে ?"

"না।"

"আমি যদি ঝিমোই, আমাকে ধাক্কা দিও"

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, পচা পাতার মিষ্টি গন্ধ উঠছে। উত্তেজনা, গোলমাল, মেসিন-গানার হত্যা—তার পরেও বৃষ্টিধারা পড়ছে—ওদের হাতে, টুপিতে, অন্ধকারের বুকে, পচা পাতার উপর স্ফটিক স্বচ্ছ বৃষ্টিধারা। পাতা নড়ছে শব্দ করে। তেলেগিণ চোখ মেললো। ডালের আবছা ইংগিত মাথার ওপর, কালো কয়লা দিয়ে আঁকা যেন .. সৈনিকরা ঘুমোচ্ছে .. ডাশা ডাশা ... স্ফটিক ধারায় জুড়িয়ে গেল প্রাণ ·

"জেগে আছেন ?"

"হা জুবৎসব।"

"কি হল ওকে মেরে ? ওরও বাড়ি আছে, পরিবার আছে। একটা সংগীনের খোঁচা মেরে তুমি ভাবলে, মস্ত বীর তুমি। মেডাল পেলে। আচ্ছা, এই যে আমি খুন করলাম এর পাপের ভাগী কে হবে ?"

"পাপের ভাগী !"

"হাঁ, পাপের ভাগী কে হবে ? পিটার্সবুর্গের কোনো হোমরা-চোমরা সেনাপতি নিশ্চয়ই। তাদের জন্যেইত আমরা যুদ্ধ করছি।"

"না, না, আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করছি।"

"সেত ঐ জার্মানটাও মনে করেছিল। কিন্তু এই যে পাপ, এর জন্য দায়ী কে ?

"ভাই, তুমি সাংঘাতিক কথা বলছ।"

"নিশ্চয়ই তাদের একজন দায়ী—সেই সেনাপতিদের একজন। আমরা তাদের খুঁজে বার করব, তাদের গলায় ছুরি বসাব।"

"কাদের ?"

"যারা দোষী।"

"জর্মানদের গলা কাট, তারাইত দোষী।"

"যারা এই যুদ্ধ বাধিয়েছে—জর্মান হোক, রুশ হোক—তাদের এর জবাবদিহি করতে হবে ...।"

গুলির শব্দ শোনা গেল, পর পর অনেকগুলো। তেলেগিণ অবাক হয়ে গেল, শত্রুরত সারাদিনে দেখা নেই। সে ফোন ধরলো, অপারেটার বল্ল, "লাইন খারাপ।"

চারদিকে বৃষ্টিধারার মত ঝরছে গুলি, মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিল্‌মভ এসে জানালো: "শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে।" কে যেন অন্ধকারের ভেতরে চিৎকার করে উঠলো: "ও. ওঃ—" মরণাহতের চিৎকার।

তেলেগিণ হুকুম দিল সবাইকে পালাতে। শুধু পাঁচজন লোক নিয়ে যতক্ষণ সম্ভব শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবে সে।

জুবৎসব, সুসভ, কোলভ, তেলেগিণকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

"আরো দু-জন। কে আসবে? বিযারকিন, তুমি?"—জুবৎসব চিৎকার করলো।

"হ্যা, আমি আসছি।"

"আর একজন, আর একজন।

আর একজন এগিয়ে এলো।

কুড়ি হাত দূরে দূরে ছটি লোক মরণ উৎসবে মেতে উঠলো। আর সবাই মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, বহুদূরে আবছা কুয়াশায়। তেলেগিণ নিঃশেষিত কার্টিজগুলো ছুঁড়ে ফেললো। গুলি ফুরিয়ে গেছে। বুদর কোট পরা সৈন্যরা ওর মৃত শীতল দেহ মাড়িয়ে যাবে, সার্টের পকেটে ডুবিয়ে দেবে তাদের নোংরা আংগুল। তেলেগিণ শিউরে উঠলো।

নরম মাটিতে সে একটা গর্ত খুঁড়লো, তারপর ডাশার চিঠি বার করে চুমু খেল সন্তর্পণে, গর্তে চিঠি রেখে বুজিয়ে দিল, শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিল তার উপর।

সুসভ আর্তনাদ করে নীরব হয়ে গেল, রাইফেলটা হেলে পড়েছে একপাশে. জুবৎসব, বিযারকিন ওরা কোথায় কে জানে। দুটো নল থেকে 'শুধু' ধূমোদগার হচ্ছে, একটা তার· আর একটা?

"কার্টিজ আছে?" কোলভ জিজ্ঞাসা করলো।

"না নেই, তোমাদের আছে?" তেলেগিণের স্বর দূর দূরান্তরে চলে গেল।

নিরুত্তর আর সবাই।

"চল আমরা পালাই।"

কোলভ পিঠের ওপর রাইফেলটা ঝুলিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। তেলেগিণও ছুটেছে।

পেছনে কার স্পর্শ না? তেলেগিণ থামলো। কাধের উপর সংগীনের ঠাণ্ডা ছোঁয়া ··· সে বন্দী!

ষোলো

"আমার ভাইকে বল্লাম : সোসাল ডেমোক্রাটদের আমি ঘৃণা করি, তোমাদের শাসন যদি কখনও আসে তোমরা লোকের ব্যক্তিত্ব ধ্বংস করে দেবে, তোমাদের বিরুদ্ধে একটা কথা বল্লে তোমরা তাকে খুঁচিয়ে মারবে। আমি তোমাদের চিনি—ইজম্-সবস্ব কল্পনাজীবির দল।"

"ও শুনে সহ্য করতে পারলো না, আমাকে খিলবা থেকে তাড়িয়ে দিল। মস্কোতে এসেছি, কিন্তু একেবারে নিঃসম্বল। ডারিয়া দিমিট্রিভনা, আপনার ভগ্নীপতিকে বলে আমার একটা কাজ ঠিক করে দিতে হবে।"

"আচ্ছা, আমি তাকে বলব।"

"এখানে আমি কাউকে চিনি না। আমাদের আস্তানার কথা মনে আছে? ভেলিয়েট মারা গেছে যুদ্ধে, বেচারী। সাপজকভ সীমান্তে, জিবভ ককেশাসে নতুন আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তেলেগিণ কোথায় জানি না। আপনার সংগে ত পরিচয় ছিল?"

ডাশা আর এলিজাবেথা চলেছে, পায়ের নীচে বরফের টুকরোগুলো শব্দ করে ভেঙে যাচ্ছে। একটা স্লেজ ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। লাইমের বরফ-মোড়া ডালপালা রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়েছে, দু-একটা পাখী চিৎকার করে চক্রাকারে উড়ছে।

"তেলেগিণের কোনো খবর নেই।" ডাশা বরফের দিকে চেয়ে এক সময় বল্ল।

"ওকে আমি ভালবাসতাম, খুব ভালবাসতাম।" এলিজাবেথা খিল খিল করে হেসে উঠলো।

এলিজাবেথার কাছে বিদায় নিয়ে ডাশা হাসপাতালের পথ ধরলো। সে নার্সের কাজ নিয়েছে।

মস্কোতে তারা এসেছে অক্টোবরে। নিকোলাই এসেই ভিড়ে গেছে ওখানকার ডিফেন্স কমিটিতে। দিন রাতে একটুও তার সময় নেই। ডাশা স্বেচ্ছাদাবী আইনের পাতায় মুড়ে রেখেছিল জীবন, কিন্তু একদিন দেশের ডাক এসে পৌছুল তার কাছে।

নভেম্বরের ঠাণ্ডা সকাল। ডাশা কফি খেতে খেতে সেদিনকার 'রাসকোয় স্লোভো'টরা পাতা ওলটাচ্ছিল। যুদ্ধের খবরের পাতায় হতাহত এবং নিরুদ্দেশ সৈন্যদের তালিকা দেখছিল। হঠাৎ সে ক্ষুদে অক্ষরে দেখতে পেল তেলেগিণের নাম নিরুদ্দেশের তালিকায়। "সার্জেণ্ট তেলেগিণ—নিরুদ্দেশ!"

একটা ছোট্ট লাইন, পিঁপড়ের মত কয়েকটা ক্ষুদে কালো অক্ষর জীবনকে বিষাক্ত করে দিতে যথেষ্ট, যথেষ্ট!

ডাশার মনে হলো, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে অঙ্গগুলো চুইয়ে, কাগজটা ভেসে গেছে রক্তে। পচা মড়ার গন্ধ, অনেক শব্দহীন চিৎকার উঠছে

ডাশা ডিভানটার উপর এলিয়ে পড়লো। দেহ কাঁপছে এক অব্যক্ত ব্যথায়।

"ডাশা কেঁদোনা। নিশ্চয়ই তেলেগিন বন্দী হয়েছে।" নিকোলাই বল্ল।

ডাশা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সে রাতে স্বপ্ন দেখলো ডাশা। সংকীর্ণ ঘর, বন্ধ জানলার ওপর ধুলো, মাকড়সার জাল, সৈনিকের পোষাক পরা কে যেন বসে আছে লোহার খাটের উপর। মুখে অমানুষিক যন্ত্রণার বিকৃতি। টাক মাথাটা অন্ধকারে চক চক করছে। ওকি! হাত দিয়ে মাথার ভেতর থেকে ঘি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করছে আর খাচ্ছে!

ডাশা চিৎকার করে উঠলো। ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পথের ঘোলাটে আলো এসে পড়েছে বিছানায়। সারা গায়ে ঘাম।

নিকোলাই ছুটে এল পাশের ঘর থেকে। এক গ্লাস জলের সংগে একটা ওষুধ ওকে খেতে দিল।

"আমি বাঁচব না, আমি বাচব না"—ডাশা বিড বিড করে বল্ল।

যুদ্ধ তাকে আলতো ভাবে ছুঁয়ে গেছে। জীবনের আশা, আনন্দ সব কিছু ঝরে গেছে তার আলগা স্পর্শে। আর পালাবার উপায় নেই। অসংখ্য মৃত্যু আর অজস্র কান্না এখন তার সত্তার সংগে মিলে এক হয়ে গেছে। এ যুদ্ধ—সারা রাশিয়ার মা-বোন, পত্নী, প্রেমিকাদের। ডাশাও তাদেরই একজন।

ডাশা মিলিটারী হাসপাতালে নার্স হল।

পুতি গন্ধ চারদিকে। আহত সৈনিকদের পচে ওঠা ঘায়ের গন্ধ, গজ ব্যাণ্ডেজের উপর হলদে পুঁজ আর দূষিত কালো রক্ত জমে উঠেছে। ডাশার মনে হয় এই জীবন যেন তার অনন্তকাল ধরে চলছে। চারদিকে বিকৃতি, দূষিত রক্ত আর গন্ধ! ওদিকে জ্বরের ঘোরে কারা যেন প্রলাপ বকে, একটা লরি রাস্তা দিয়ে চলে যায়, কেঁপে ওঠে ওষুধের শিশিগুলো। ঘরে মন্থর নীল আলো। এইত প্রকৃত জীবন!

ডাশার মনে পড়লো এলিজাবেথার হাসি, "ভালবাসতাম, তেলেগিণকে আমি ভালোবাসতাম।" অমনি করে সেও ত বলতে পারে রাস্তায় কাউকে: "ভালোবাসি ··· ভালোবাসি"। একটা মিষ্টি স্বাদে যেন জিভ ভরে গেছে।

"ঘুমোচ্ছ ?"

ডাশা দেখলো, পনের নম্বরের আহত সৈনিকটি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"তুমি ঘুমোওনি এখনো ?"

"দিনে ঘুমিয়েছিলাম।"

"হাতে এখনও ব্যথা ?"

"একটু ভাল, বোন। তোমার খুব ঘুম পাচ্ছে নিশ্চয়ই ?"

"না।"

"তোমার কেউ যুদ্ধে গেছে ?"

"হাঁ, আমার স্বামী।"—ডাশার গলা বুজে এল।

"ঈশ্বর তাঁকে বাচান।"

"সে নিরুদ্দেশ।"

"আমার ছোট ভাইটাও তাই। কি নাম তোমার স্বামীর ?"

"তেলেগিণ, আইভান ইলিইচ্ তেলেগিণ।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। হাঁ, হাঁ মনে পড়েছে, সেত বন্দী হয়েছে কোন রেজিমেণ্ট ?"

"কাজান।"

"ঠিক, ঠিক। সে বন্দী হয়েছে," সৈনিকের গলার স্বর আরও নিচু হয়ে এলো। "দুঃখ কোরোনা বোন। বরং দেখে যাবে যুদ্ধ শেষ হবে, তোমার কোলে আসবে তেলেগিণের খোকা।"

সৈনিক মিছে কথা বলছে। তেলেগিণের নামও সে শোনেনি। তবুও ডাশা শুনলো তার কথা। এই মিছে সান্ত্বনাটুকুরও অনেক দাম।

ফোন বেজে উঠলো। ডাশা উঠে এসে ফোন ধরলো :

"কাকে চাই ?"

"ডারিয়া দিমিট্রিভ্না বুলেভিনকে, তিনি আছেন কি ?" মৃদু স্বর শোনা গেল।

"কে ? কাটিয়া ? ··· কাট্‌সা ··· তুমি ? তুমি ?"

সতেরো

"আমরা আবার সবাই একত্র হয়েছি। কাটিয়া তোমার কাল ভালো ঘুম হয়েছে ?" নিকোলাই কাটিয়ার গালের উপর একটা চুমু খেল। "ডাশা, আজকের খবর কী ?"

"কি আবার খবর ? সেই আহত আর মৃতদের তালিকা। কাটিয়া বাঁচতে আর একবিন্দু ইচ্ছে হয় না।"

"এইবারইত আসছে আমাদের সত্যিকারের বাঁচার পালা।" নিকোলাই হাসলো। "এতদিন রাশিয়া ছিল আমাদের কাছে মানচিত্রের ওপরে সবুজ খানিকটা জায়গা। আজ সেই সবুজ রংটুকু বজায় রাখবার জন্তে প্রতিমুহূর্তে

হাজার হাজার লোক প্রাণ দিচ্ছে। রাজশক্তি বুঝতে পেরেছে, দেশকে বাঁচাতে হলে চাই জনগণের সাহায্য।" নিকোলাই একটা সিগারেট ধরালো। "খুব আশাবাদীর মত কথা বলছি না? কিন্তু এই এত রক্তপাত, এতো বৃথা যেতে পারে না! এতদিন ধরে স্বাধীনতা সংঘ, বিদ্রোহী বা মার্কস পন্থীরা যা করতে পারেনি, যুদ্ধ তাই করবে।"

নিকোলাই চলে গেল।

বাইরে বরফ পড়ছে, ঘরের দেয়ালে পড়েছে আলোর রেখা। ডাশা কাটিয়ার চুলের উপর হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞস করলো।

"কাটুসা, কেমন কাটালে প্যারিতে?"

"কেন, চিঠিতে ত তোমাকে সবই জানিয়েছিলাম।"

"কাটুসা, তুমি অমন মন মরা কেন?"

"মনে সুখ নেই, তাই।"

"আমি সব পেয়েছি," কাটিয়া আপন মনে বল্ল।"

"স্বামী, দেবতুল্য স্বামী, চমৎকার বোন, অফুরন্ত স্বাধীনতা—সব পেয়েও আমি অসুখী। ··· না, ডাশা, আমার জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে।"

"কি বাজে বকছ?"

"তুমি জানো না, ডাশা কত রাতে স্বপ্নে দেখেছি, পড়ে আছি মাটিতে, শুকনো দেহ, শাদা চুল। ঘুম ভেঙে গেছে। আয়নায় মুখ দেখেছি ভালো করে।"

কাটিয়া জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো ফুলের মত বরফ ঝরছে। ক্রেমলিনের চূড়ায় দাঁড়কাক উড়ছে।

"প্যারিতে সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিছলো। রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে, আকাশ ঝলমল করছে আলোয়, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা চলেছে বই বগলে। আমার বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল বুলেভারে। ওখানে এমন কাউকে হয়তো পাব, যে আমাকে ভালোবাসবে। বুলেভারে এসে যখন পৌছুলাম, তখন প্যারী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। হকাররা চিৎকার করছে, পথে পথে উত্তেজিত জনতা। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেইদিন থেকে শুধু শুনছি : মৃত্যু, মৃত্যু, আর মৃত্যু।"

কয়েক মিনিটের নীরবতা। ডাশা ডাকলো : "কাটুসা!"

"কি?"

"নিকোলাইর সংগে ও বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে?"

"না। ডেসেনকা, নিকোলাই বলছিল তুমি নাকি তেলেগিণকে কথা দিয়েছ?" কাটিয়া ডাশার হাতখানা বুকের ওপর তুলে নিল।

"ভয় নেই বোন. তেলেগিণ বেঁচে আছে।"

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। বরফ পড়ছে, একদল সৈন্য চলেছে গান গেয়ে :

"ওঠ বাজের মত আকাশে, নেমে এস ঈগলের মত ..."

কাটিয়ার দিন একা কাটছে। ডাশা হাসপাতালে চলে যায়, নিকোলাইও কাজে ব্যস্ত। কাটিয়া থিয়েটারে গেল, যাদুঘর দেখলো; চিত্র প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়ালো। সবই যেন কেমন রং-চটা, বিবর্ণ! বই পড়তে ভাল লাগে না, চিন্তা করতেওনা। অলস প্রহর সে কাটায় জানলার ধারে। বরফে মোড়া সারা সহর, শুভ্র বিষণ্নতা নেমেছে। ক্রেমলিনের সোণার ঈগলটার চারধারে কাকের ভিড়। একটা স্লেজ চলে যায়, চাকার ঘাযে ঠিক্‌রে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ।

লোকের জীবন এসে পৌছেছে খবরের কাগজের পাতায়। গুজব, উন্মাদনা, সংবাদপত্রের শিরোনামায় রুশবাহিনীর সাফল্য সংবাদ—এই ত জীবন!

কাটিয়া হাসপাতালে কাজ নিল।

আঠারো

"ক্রমেই দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে।"

"ভেবে কি হবে, চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়।"

"না, না রাশিয়ার বড দুর্দিন। চারদিকে বিশ্বাসঘাতকতা চলছে। শত্রুকে কাযদায় এনে ফেলেছি, এমনি সময ওপরওলার হুকুম, "পেছু হটো।"—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিনই ত এই ব্যাপার।"

একটা মাটির দেয়াল-দেয়া খড়ের ঘরের মধ্যে আগুনের ধারে গল্প করছিল তিনজন সৈনিক।

"এক ঘেয়ে লাগছে জীবন। হয় এগোচ্ছি, নয়ত পেছোচ্ছি, তারপর আবার এগোনো। ফল কিছুই হচ্ছে না।" সৈনিকটির স্বরে ঘৃণা।

"একটা ফল হচ্ছে বইকি! আশে পাশের গ্রামগুলোর মেয়েরা গর্ভবতী হয়েছে।"

"কিছুক্ষণ আগে আমাদের লেফটেনান্ট সাহেব এসেছিলেন, কিছুই করবার নেই তার। আমার প্যান্টে ফুটো হয়েছে কেন, এই নিয়ে আমাকে গালাগাল দিলেন। তারপর এক ঘুষি।"

"সাতটা করে গুলি এক একটা রাইফেলের জন্য বরাদ্দ। তোমার ওপর গুলি চালালে যে একটা খরচ হয়ে যেত। লোকটা হা হা করে হেসে উঠলো।"

"না ওর ঘুষি মারবার অধিকার নেই!"—একজন রেগে উঠলো।

"অধিকার! অধিকার! এই যে সমস্ত জাতটাকে সৈন্য তৈরী করেছে তার অধিকার কি ওদের আছে?"

'ঠিক ঠিক।"

"সেদিন ওয়ারসএর কাছে একটা মাঠে দেখলাম, পাঁচ, ছশ লোক মরে পড়ে আছে। কেন, কেন তারা জীবন দিল? ··যুদ্ধসভা পরামর্শ করলো, একজন হোমড়া-চোমড়া সেনাপতি বেরিয়ে এসে গোপনে বার্লিনে খবর পাঠালো। সাইবেরিয়ার বাছাই করা সৈন্য এগিয়ে চললো মাঠের দিকে, ওদিকে শত্রুদের মেসিনগান চেঁচাতে শুরু করেছে। পাঁচ পাচশ লোক প্রাণ দিল। কিন্তু কেন, কেন? আমি তোমাদের বলছি, রাশিয়ার আর কোনো উপায় নেই, বিশ্বাসঘাতকরা শত্রুর হাতে তাকে তুলে দিয়েছে। আমাদের গ্রামের সেই সয়তানটার কথাই ধর না। লিখতে-পড়তে জানে না, কোনোদিন কোনো কাজে আসেনি—গেযে মানুষ আর ভড়কা গেযে জীবন কাটিয়েছে। এখন সে রাশিয়াকে নিয়ে যা খুসি তাই করছে। জার তার পায়ের তলায়, রাণী তাকে দেবতা বলে মনে করেন। অথচ লোকটা তলায় তলায় খাচ্ছে জার্মানীর টাকা। এই বিশ্বাসঘাতকদের জন্য আমরা মরছি, আর তারা হল্লা করছে পানশালায়, তাদের মেয়েরা ন্যাংটো হয়ে নাচছে। জার্মানী থেকে আসছে ওদের টাকা, আর কি চাই?"

লোকটা থামলো। চারদিক নিঝুম, ঘোড়াগুলো কুচকুচ করে নিচু চালের থেকে খড় খাচ্ছে, দেয়ালের উপর মাঝে মাঝে ঝাড়ছে চাট। একটা নিশাচর পাখী আগুনের কুণ্ডটার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। পূবের আকাশে কিসের শব্দ। একটা বন্যজন্তু যেন রাত্রির অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছুটে আসছে। কিছুদূরে শোনা গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। ঘোড়াগুলো ডাকছে।

"যাক্!" একজন সৈনিক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

তারাহীন আকাশটা আবার কেঁপে উঠলো। আর একটা গোলা কাছে কোথায় ফেটেছে, পিরামিডের আকারে ধোঁয়া উঠছে। তারা তিনজন মাথা উঁচু করে দেখলো। আবার, আবার ··· চিৎকারে কাণে তালা ধরে গেছে। তারা শেডের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলো। মাথার উপর অদৃশ্য বিদ্যুৎ ঝলক থেকে গর্জন উঠলো, কালো ধোঁয়ার মাথায় আগুনের লক্‌লকে ফণা।

ধোঁয়া কমতে দেখা গেল শেড আর তিনটি সৈনিক মিলিয়ে গেছে। আগুনের ভেতর থেকে উঠছে একটা ঘোড়ার অব্যক্ত আর্তনাদ।

পদস্থ সামরিক কর্মচারীদের ট্রেঞ্চে ভোজ চলছিল। ক্যাপ্টেইন টেটকিনের ছেলে হওয়ার খবর এসেছে তারই ভোজ। প্রকাণ্ড ট্রেঞ্চের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে গেছে মোমবাতির আলোয়। অতিথি, আটজন সামরিক কর্মচারী, হাসপাতালের ডাক্তার আর তিনটি নার্স। সবাই পান করেছে প্রচুর। টেটকিন

এককোনে হাতের ওপর মাথারেখে ঘুমোচ্ছে, মোমের আলো এসে পড়েছে প্রথমার গলার ওপর ; শাদা ধব ধব করছে। দুটি কর্মচারী ক্ষুধাত দৃষ্টি মেলে দেখছে। দ্বিতীয়াটি গাইছে জিপসী গান। তার স্তাবকরা গানের ফাঁকে ফাঁকে চিৎকার করে উঠছে: এই ত জীবন, এই ত জীবন! তৃতীয়া এলিজাবেথা কিয়েভনা। তারপাশে লেফ্টেনাণ্ট জ্যাডভ, লম্বা-চওড়া জোয়ান চেহারা, প্রচুর পানেও তাকে কাহিল করতে পারেনি। সে এলিজাবেথার কাছে নিজের জীবনের কথা বলছে। সেই মোলডাভিয়ার ষ্টেপে তার শৈশব, তারপর সৈনিকের জীবন। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। ওদিকে গীটার বাজিয়ে গান চলছে, পানোন্মত্ত হল্লা। প্রথমা হাসছে, স্খলিত হাসি!

"চমৎকার আপনাদের জীবন!" এলিজাবেথা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, "এমনি বীরের জীবন-ই ত সকলের কাম্য।"

"বীর!" জ্যাডভ হাসলো, "বীর কেউ পৃথিবীতে আছে নাকি?"

"কি বলছেন আপনি—দেশের জন্য এই আত্মোৎসর্গ—এ কি বীরত্ব নয়?"

"ওসব ভূয়ো কথা। আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি ভয়ে, বীরত্ব বা আত্মোৎ-সর্গের ছিটে-ফোঁটাও তাতে নেই। অবিশ্যি কারো কারো মগজে আছে খুনের লালসা। তাকেই আমরা বলি বীরত্ব, তাই নিয়ে তৈরী হয় গান, অমর করে রাখে ইতিহাস।"

"আপনাকেও খুনের লালসা পেয়ে বসেছে?"

"হয় ত খুনের লালসা, নয় ত ভয়।"—জ্যাডভ হেসে উঠলো, "প্রথমটা থাক ইতিহাসের পাতার বীরদের জন্য। আমরা যে হত্যার উৎসবে মেতেছি, সে শুধু ভয়ে। ওপরওলা মঞ্চোয়ে বসে চাবুক মারছে, আর আমরা ছুটে চলেছি তারই তাড়নায়—বোবা পশুর মত। এখানে বীরত্ব কোথায়?"

জ্যাডভ একটা সিগারেট ধরালো: "আমায় ক্ষমা কর লিজা, নেশার ঘোরে যা-তা বকে চলেছি। চল, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানো যাক মাথায়।"

ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে ওরা বাইরে এসে দাঁড়ালো। নিস্তব্ধতা, পচা পাতার গন্ধ উঠছে, পেছনে গীটারের শব্দ, স্খলিত হাসি। গানের একটা কলি! রাতের নিশ্বাসে কামনা ঝরে পড়ছে ···

ঘন অন্ধকারে এলিজাবেথা হঠাৎ অনুভব করলো জ্যাডভ তার হাত চেপে ধরেছে। ঠাণ্ডা বরফের মত স্পর্শ, অথচ রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। সে তার পরিপূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চায়।

"লিজা!" জ্যাডভের স্বর কেঁপে উঠলো আবেগে।

"লিজা, আমি জানি আমি তোমাকে ভালোবাসি না, ভালোবাসতে পারি না, ··· ভালোবাসব না কখনও, তবু আমি তোমাকে চাই।" জ্যাডভ এলিজাবেথাকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালের ওপর চুমু খেল, গনগনে কয়লার মত উত্তপ্ত চুমু।

এলিজাবেথা তার আলিংগন থেকে মুক্তি চাইলো, কিন্তু পারলো না। পাইথনের মত দৃঢ় বন্ধন, হাড় যেন মট মট করে ভাঙছে। অবসাদে ভারী হয়ে এসেছে শরীর, কানে শব্দের অন্তহীন এলোমেলো তরংগ।

"তোমাকে আমি চাই, পেষণে-নিপীড়নে তোমাকে আমি গুঁড়িয়ে ফেলতে চাই, নিঃশেষ করে দিতে চাই।"

"ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন!" এলিজাবেথার স্বরে নেমে এসেছে ক্লান্তি।

"তোমাকে ছাড়বো না, না—"

হঠাৎ একটা কর্কশ চিৎকার অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে এলো, হাজারটা উন্মত্ত বরাহ যেন গর্জন করে ধেয়ে আসছে, পীরামিডের মত কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারিদিক। এলিজাবেথা লুপ্ত শক্তি ফিরে পেয়েছে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে রক্তস্রোত উদ্দাম হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে আর একটা গোলা ফাটলো পাশে, ধোঁয়ার পিরামিডের ওপর আঁধারের ঘন আস্তর, চোখে দেখা যায় না, কাণে শোনা যায় না। বাঁচতে হবে, এলিজাবেথাকে বাঁচতে হবে। বিষাক্ত হিম-শীতল আলিংগন থেকে সে ছিটকে পড়লো। আর জ্যাডভ?

পরদিন হাসপাতালে সে অস্ত্রোপচারের টেবিলের উপর দেখলো জ্যাডভকে। নাক ভেঙে গেছে, মুখ ক্ষত-বিক্ষত। এলিজাবেথার দেখে মায়া হল। আহা বেচারী!

উনিশ

কাটিয়া 'কদিন ধরে নিউমোনিয়ায় ভুগছে। পাতের মত লেগে আছে বিছানায়। শীর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল পেছনের দিকে আঁচড়ে দেয়া। ডাশা ওর বিছানার পাশে বসলো। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ শোনা যায়।

"এখন ক-টা?"

"আটটা।"

কাটিয়া অনেকক্ষণ রোগার্ত করুণ-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো ডাশার দিকে, তারপর আবার বল্ল "কটা?"

কয়েকদিন ধরে ঐ একই কথা তার মুখে ঘুমের ফাঁকগুলো সে ভরে রেখেছে ঐ একটি প্রশ্ন দিয়ে। তন্দ্রার ঘোরে সে দেখে, চলেছে দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে; ধুলো-ভরা শার্সীর ভেতর দিয়ে আলোর রেখা এসে পড়ছে দেয়ালে। সারি সারি ফ্লাট দরজা দেয়া।

ঐ দরজা গুলো যদি দমকা হাওয়ায় খুলে যায়, ওর পেছনে আছে শ্যাম প্রান্তর, পাখীরা সেখানে গান করে, কাস্তের মত কৃশ চাঁদ ঘাসের চুল আঁচড়ে দেয়। হয়ত তার পরিভাষা মৃত্যু। ওখানে সে পৌঁছাবে, স্বপ্ন ভেঙে যায়। বন্ধ দরজার আড়াল থেকে পিষ্ট শব্দের আর্তধ্বনি তাকে পাগল করে তোলে।

"ক'টা বাজে এখন?"

"কাটুসা, বারবার সময় জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"ডাশা এখানে!" ··· কার্পেটের উপর দিয়ে সে চলেছে, শার্সীর ভেতর দিয়ে আলোর রেখা পড়েছে। ফ্লাটগুলোর বন্ধ-দরজার আড়ালে পিষে-যাওয়া শব্দ।

"শুনতে চাইনা···দেখতে চাইনা ··· অনুভব করতে চাইনা ··· বালিসে মুখ লুকিয়ে শুয়ে থাকব ... শেষ মুহূর্ত্ত আসবে ঘনিয়ে। কিন্তু ডাশা চুমু খাচ্ছে, কাঁপা, নিঃসাড় দেহে আবার সঞ্চারিত হচ্ছে জীবন। কিন্তু এ জীবনে ত আমার প্রয়োজন নেই, মৃত্যু এর থেকে শতগুণে ভালো। ·· ডাশা আমাকে মরতে দেবে না!"

"কাটুসা, কাটুসা!"

"আমাকে সে যেতে দেবে না।"

"আমি চলে গেলে ডাশার যে আর কেউ আপন বলে থাকবে না!"

"ডাশা!"

"কি বলছ?"

"আমি ভালো হয়ে উঠব বোন, মরতে কে চায়?"

কে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে? বাবা! বাবা সামারা থেকে মস্কো এসেছেন! একটা ছুঁচ ফুটছে যেন, তীক্ষ্ণ-মধুর ব্যথা বুকে। রক্তে উত্তেজনা নেই। দেয়ালটা সরে গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া এক ঝলক ঢুকেছে ঘরে। কি আরাম! ডাশার হাত হাতের ওপর। এক মুহূর্ত, তারপর দেহ ছেয়ে যাবে নিদ্রার গাঢ় অন্ধকারে। জ্বলজ্বলে হলদে রেখাগুলো আবার ভিড় করে এল, আবার সেই হলদে দেয়াল।

"ডাশা, ডাশা, আমাকে বাঁচাও!"

ডাশা ওর মাথাটা সযত্নে তুলে নিয়েছে কোলে। উত্তপ্ত, জ্বালাময়ী জীবনীশক্তি ওর মৃত-প্রায় দেহকোষে ঢুকছে: কাটিয়া বাঁচ, বাঁচ তুমি!

সেই হলদে সিঁড়ি তবু চোখের সমুখে ভাসছে, সেই ঘোরাণো সিঁড়ি। তাকে নামতে হবে, শ্লথ পায়ে হোঁচট খেতে খেতে নামতে হবে। শুয়ে থাকলে ত চলবে না!

তিন দিন ধরে চললো মৃত্যুর সংগে যুদ্ধ। এই তিনদিন ডাশা একবারও কাটিয়ার কাছ থেকে নড়েনি। তাদের সত্তা যেন এক হয়ে গেছে। শেষদিনের ভোরের দিকে কাটিয়া ঘামতে শুরু করলো। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায় না। ডাশা

ভয়ে ভয়ে বাবাকে ডেকে আনলো! পরদিন ভোর সাতটায় ডাশার বাবা বল্লেন, "এবার কাটিয়া বেঁচে উঠলো।"

ডাশা তিনদিন পরে কাটিয়ার বিছানার পাশে ঘুমিয়ে পড়লো। নিকোলাই তার শ্বশুর দিমিত্রি ষ্টেপানোভিচকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পেলো না। তার চিকিৎসার গুণেই ত কাটিয়া এবার রক্ষা পেল!

পরদিনটা বেশ আনন্দে কেটে গেল। দোকান থেকে একগোছা শাদা লিলাক এনে ড্রয়িং রুমের বড় ফুলদানিটায় নিকোলাই সাজিয়ে রাখলো। ডাশার মনে হল মৃত্যুর হাত থেকে সে-ই কাটিয়াকে ছিনিয়ে এনেছে। সেই হলদে সিঁড়ি—কাটিয়া যার কথা প্রলাপ বকছিল, তার এত কাছে ডাশা ছিল এই তিনদিন। সেখানে সে শুনেছে মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি। মৃত্যু—কবির কাব্যে, মানুষের অলস কল্পনায় তার শান্ত, সুন্দর রূপ পরিস্ফুট; অথচ প্রকৃত মৃত্যু এত নিষ্ঠুর, এত ভয়ংকর! ডাশা বুঝতে পেরেছে, নতুন করে পেয়েছে জীবনের স্বাদ।

মে মাসের শেষে ওরা মস্কোয়েব কাছেই এক নির্জন গ্রামে এসে বাসা করলো। কাঠের ছোট্ট বাংলো, একধারে শাদা বাচের বন ছড়িয়ে আছে, অন্যদিকে মাঠ, মাঠের পর মাঠ।

এখানে জীবন ইতিহাসের প্রথম পাতায় বন্দী হয়ে পড়ে আছে। নেই নগরের কোলাহল, নেই জনতা আর রাজনীতির জটিল আবর্ত। বার্চ বনের ছায়ায় গরু চরছে, হাওয়ায় দুলছে শস্যশীর্ষ; কোথায় যেন ঝরণা বয়ে চলেছে, মেঘ জমেছে আকাশে। মাঝে মাঝে শুধু ট্রেনের একটা তীব্র হুইস্‌ল নিস্তব্ধতা ভেঙে ছুটে যায়। ইতিহাস আদিমতা থেকে বিংশ শতকে পা দেয়। তারপর আবার নীরবতা, বাচবন, কালোমেঘ আর মাঠ।

জুনের প্রথমে এক সকালে ডাশা একখানা অদ্ভুত পোষ্টকার্ড পেল। পোষ্টকার্ডে লেখা: "ডাশা, কেন তুমি আমার একখানা চিঠিরও উত্তর দিলে না? একখানাও কি পাওনি?"

ডাশা চেয়ারে বসে পড়লো। চোখের সমুখে কুয়াশার আস্তরণ, পা দুটো অসম্ভব ভারী ··· "আমার ক্ষত সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। এখন রোজ একটু একটু ব্যায়াম করছি। আর একটা খবর ফরাসী আর ইংরেজি শিখছি। আমার চুমু নিও, যদি তুমি আমাকে ভুলে না গিয়ে থাক।—ইতি তেলেগিণ।"

ডাশা আবার পড়লো চিঠিখানা। "যদি ভুলে না গিয়ে থাক।" ডাশা কাটিয়াকে চিঠিখানা দিয়ে বল্ল, "পড়ে দেখ কাটিয়া।"

কাটিয়া পড়লো, "যাক্ তেলেগিণ বেঁচে আছে!"

"... কিন্তু কবে, কবে এই যুদ্ধ থামবে?"

নিকোলাইকে চিঠি পড়তে দিয়েও ডাশা ঐ একই প্রশ্ন করলো। "কবে যুদ্ধ থামবে ?"

"কে জানে।"

"এইটুকু যদি না জানেন ত, কি যুদ্ধের কাজ করলেন এতদিন বসে। থাক, আমি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকেই জিজ্ঞেস করব ...।"

"কি জিজ্ঞেস করবে ? ডাশা, ডাশা, অধীর হয়োনা, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

ডাশার উত্তেজনা কমে গেল ক'দিন পরে। আবার ফিরে এসেছে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য। সে তেলেগিণকে পাঠালো চিঠি আর একটা ছোট পার্শেল। কাটিয়া তেলেগিণের কথা উত্থাপন করলেও এখন সে চুপ করে থাকে। সান্ধ্য ভ্রমণ সে ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়ে, না হয় সেলাই করে সময় কাটায়। তেলেগিণকে সে ভোলেনি, শুধু বাইরের উচ্ছ্বাসকে এনেছে অন্তরের গভীরে, তার ওপরে টেনে দিয়েছে প্রত্যহের যবনিকা।

যুদ্ধ ঘোরালো হয়ে উঠছে দিনের পর দিন, জিনিসপত্রের দাম চড়ছে। রুশ-বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করছে সাফল্যের সংগে। ওয়ারস তারা ত্যাগ করেছে, ব্রেষ্ট লিটোভ্স্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে শত্রুর কামানে। তার ওপর আছে গুজব, নিত্য নতুন গুজব গজিয়ে উঠছে।

ডাশা আর নিকোলাই সেদিন মস্কো গেছে। কাটিয়া জান্‌লায় বসেছিল। পরিষ্কার ঝকঝকে দিন। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের ওপর, ঝাউবনের মাথায়। কাটিয়া বসে বসে দেখছিল। গ্রামের ছোট পার্কটার কাছে অনেক লোক জমেছে, কি যেন দেখছে তারা ? কার স্বর কাণে এল, "ওরা মস্কোতে জার্মানদের পুড়িয়ে মারছে। দেখচনা তারই ধোঁয়া !"

কাটিয়া আকাশের পানে তাকালো। স্বচ্ছ মেঘমুক্ত আকাশ, দিগন্তে ধোঁয়ার কুণ্ডলী কালো ফণা তুলে এগিয়ে আসছে আকাশকে গ্রাস করতে। জনতার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। এবার টুকরো টুকরো কথা তার কাণে এল :

"ও ধোঁয়া মস্কো থেকে আসছে না, দেখচনা অনেক দূরে।"

"ওয়ারস জার্মানরা পুড়িয়ে দিচ্ছে।"

হাঁ, তুমি ত ভারি জান ? ওয়ারস নয়, ও মস্কোর ধোঁয়া। দু-হাজার জার্মানকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে।"

"দু-হাজার নয় হে, ছ'হাজার। পুড়িয়ে মারবে কেন, ডুবিয়ে মেরেছে। এবার গুপ্তচরদের পালা।"

"সব বড় বড় লোক জার্মানীর দালাল ! আমার বোন বল্ল, পেট্রোভস্কি পার্কের এক বাংলোয় একটা বেতার যন্ত্র শুদ্ধ দুটো গুপ্তচরকে ধরা হয়েছে—বেশ বড়লোক হে তারা !"

"আমাদের রক্ত শুষে বড়লোক হয়েছিলেন, এবার বুঝুন মজা!"

কাটিয়া দেখলো, জনতা এবার পার্ক ছেড়ে পথে উঠেছে। চিৎকার করতে করতে তারা চলেছে। মেয়েরা হাতের শূন্য থলেগুলো নাড়ছে আর হাসছে। একজন বুড়ো চাষা জান্‌লার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, কাটিয়া তাকে জিজ্ঞেস করলো, "মেয়েরা কোথায় চলেছে থলি হাতে?"

"লুঠ করতে।"

ছটার সময় নিকোলাই আর ডাশা ফিরলো মস্কো থেকে। তাদের কাছে কাটিয়া শুনলো মস্কোর ব্যাপার। জনতা ক্ষেপে উঠে জার্মানদেব বাড়ি ঘর দোকান-পাট সব পুড়িয়ে দিয়েছে। মেণ্ডেলের দোকানের পোষাক তারা লুঠ কবে নিয়ে গেছে। কুজনেৎসিক পাড়ায় বেকারের পিয়ানোর দোকানের একটা পিয়ানোও আস্ত নেই। জনতা তার কাঠ দিয়ে বহ্নি উৎসব করেছে। লুবিনান্স্ক স্কোয়ারে ওষুধের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অবশেষে পুলিশ এসে গুলি চালিয়ে জনতাকে কবেছে ছত্রভংগ।

"একে নিশ্চয়ই বর্ববতা বলব," নিকোলাইর চোখ দুটো জ্বলছে উত্তেজনায়, "কিন্তু এর পেছনে দেশেব যে প্রাণের সাড়াটুকু আজ পেলাম, তাব তুলনা নেই! আজ তারা জার্মানদের বাড়ী ঘব পুড়িয়ে দিচ্ছে, দোকান লুঠ কবছে, কাল তাবা কি করবে জান? অবরোধ-প্রাচীর গড়ে তুলবে। আজ সরকাব নিজেদের সুবিধেব জন্য জনতাকে সুযোগ দিচ্ছে লুঠ-তরাজেব, কিন্তু এমন দিন হযত আসবে যখন·

নিকোলাই হেসে উঠলো।

সেই রাতেই গ্রামে অনেকগুলো ছোটখাটো চুরি হয়ে গেল। গ্রামের আবহাওয়া গুমোট। লোকের মনে অসন্তোষ বেশ ধুঁইয়ে উঠছে, কখন জ্বলে উঠবে কে জানে। আর তাদের দৃষ্টিতে নেই দাসত্বের বিগলিত কোমলতা, সেখানে এসেছে বিদ্রোহের শাণিত ঝিলিক। সেই শাণিত দৃষ্টি ফেলছে তারা বাংলোগুলোর ওপর।

অগাষ্টের প্রথমে কাটিয়ারা মস্কোয়ে ফিরে এল। কাটিয়া আবার হাসপাতালে কাজ শুরু করেছে। এবার মস্কোয়ে পোল রিফ্যুজিদের খুব ভিড়। কাফেতে, থিয়েটারে, দোকানে, পথেঘাটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ওরা।

নগরে বইছে তেমনি বিলাসিতার স্রোত, তেমনি চপল জীবন। কাফে আর থিয়েটারে ভিড়, পথে পথে লোকের মিছিল। একটুও বদলায়নি নগর। জীবন্ত এক দেয়াল তাকে ঘিরে রেখেছে, যুদ্ধের করাল হাতের ছোঁয়া লাগতে দেয়নি তার দেহে। সেনাবাহিনী সেই দেয়াল, কোটি কোটি সৈনিকের রক্ত-বিন্দুর ওপর তার ভিত্তি।

এদিকে সামরিক পরিস্থিতি জটিলতরো হয়ে উঠেছে। রাসপুটিনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা সেনাদলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়ার আর আশা নেই, এখন যদি একমাত্র সেণ্ট নিকোলাই তাকে বাঁচাতে পারেন!

ভাঙন ধরেছে দিকে দিকে; জনতার অসন্তোষ, সেনাদল ক্লান্ত, নিরুৎসাহ। এমন সময় খবর এল, জেনারেল রাস্‌কি জার্মানদের হটিয়ে দিয়েছেন। রাশিয়া আবার নতুন জীবন ফিরে পেল। সেণ্ট নিকোলাই দয়া করেছেন!

কুড়ি

ঝোড়ো হাওয়া বইছে। পপলার গাছগুলো মুইয়ে দিয়ে বইছে হাওয়া, ঝন্ ঝন করে নড়ে উঠছে পুরোনো বাড়িটার দরজা-জান্‌লাগুলো। মেঘ জমেছে আকাশে, দূরে সীসে রঙের সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে। কন্ কনে ঠাণ্ডা!

জ্যাডভ একটা জীর্ণ সোফায় বসে আছে, এলিজাবেথা তারপাশে। ভাঙা টেবিলটার ওপর রয়েছে মদের গেলাস। লাল পানীয় টল টল করছে। দুজনেই চুপ করে আছে। হাতের ফাঁকে-ধরা সিগারেট থেকে ক্ষীণ সুতোর মত ধোঁয়া উঠছে।

এই তাদের জীবন!

ছ মাস আগে হাসপাতালে এমনি এক ঝোড়ো রাতে, জ্যাডভ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল: "অমন গরুর মত ড্যাবডেবে চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছ কেন? অমন করে তাকিয়ে থাকলে আমার ঘুম আসে না। যাও, একটা বুড়ো পাদরীকে ডেকে নিয়ে এস, চুকে যাক ব্যাপারটা।"

তারপর তাদের বিয়ে। বিয়ের পর তারা এসে সংসার পেতেছে এই সাঁতু কাবার্ণে। জ্যাডভের বাপের সম্পত্তি। এক পয়সা সম্বল তাদের নেই। জ্যাডভ সরকার থেকে পেন্সন পায়নি। পুরোনো আসবাব, থালা-বাসন বিক্রি করে তাদের কোনো রকমে দিন কাটছে। কিন্তু মদ তারা খাচ্ছে প্রচুর। জ্যাডভের বাপ সাঁতুর সেলারে রেখে গেছেন মদের অফুরন্ত ভাণ্ডার। জ্যাডভ সারাদিন মদ খায়, কথা বলে না। এলিজাবেথাকেও সে কথা বলতে বারণ করেছে। ছ'বোতলের পর জ্যাডভ শুরু করে তার দীর্ঘ বক্তৃতা। কর্কশ রুক্ষ স্বর যেন সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়ার সংগে পাল্লা দেয়।

এইত তাদের জীবন, বিবাহিত জীবন!

কিছু করবার নেই, ভাববার নেই; গা ভাসিয়ে দিয়েছে তারা অনির্দেশের স্রোতে। অতীত তাদের লুপ্ত, ভবিষ্যৎ নেই।

ছ'বোতলের পরেও আজকাল জ্যাডভ আর মুখ খোলেনা, যা কিছু বলার শেষ হয়ে গেছে, মগজের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে এসেছে নিষ্ক্রিয়তা।

এলিজাবেথা প্রথমে এই দীর্ঘ অলস দিনগুলিকে ভরে দিতে চেয়েছিল ভালোবাসায়, স্বামীর সেবায় হয়ে উঠেছিল কর্মিষ্ঠা, কিন্তু জ্যাডভের বিদ্রূপ তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে সেখান থেকে। এখন সেও গা ভাসিয়ে দিয়েছে। দারিদ্র্য, অপমান, একঘেয়েমি, তবুও এ জীবনের কোথায় যেন একটু মধু লুকিয়ে আছে, দেহের শিরায় শিরায় তার আবেশ। এ জীবন সে ছাড়তে পারবে না।

ঝোড়ো হাওয়া বইছে কদিন ধরে। উলংগ সৈকতের ওপর দিয়ে হাজার হাজার অদৃশ্য মত্ত হস্তী ছুটে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে, পুরোনো সাঁকুর ওপর, গোঙানি উঠছে। দেয়ালের ফাটলের ভেতর দিয়ে গোঙানি ঝড়ে পড়ছে। এলিজাবেথা কাণ পেতে শুনলো, রক্তে রক্তে অনুরনণ। আর জ্যাডভ? ঝোড়ো হাওয়ার সংগে সেও যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

"হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কি? যাও সেলার থেকে মদ নিয়ে এস।" জানলা থেকে মুখ না ফিরিয়েই জ্যাডভ কর্কশ স্বরে বল্ল।

এলিজাবেথা উঠলো। ইতিমধ্যে তিনবার সে সেলারে গেছে মদ আনতে। ইঁট বার করা, নোনা-ধরা দেয়াল, মাকড়সার জালে ভরা। তবু ঐ তার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল, যা কিছু আনন্দ যেন ওখানেই লুকিয়ে আছে। এলিজাবেথা দিনের পর দিন ওখানে কাটিয়ে দিতে চায়।

নরম ঘন অন্ধকারে পিঁপেগুলো পড়ে আছে; একটা পিঁপে থেকে, টপ্‌টপ্‌ করে মাটির ভাঁড়ে পড়ছে লাল রঙের মদ। একদিন জ্যাডভ হয়ত তাকে এখানে খুন করে পিঁপের নিচে ফেলে রাখবে। কি মজা! দেহের ওপর পিঁপেটা চেপে বসেছে; চুইয়ে-পড়া মদে ভিজে গেছে দেহ। তারপর চলে যাবে অনেক ঝোড়ো রাত। একদিন জ্যাডভ ফিরে আসবে সেলারে, হাতের মোমবাতিটা তার কেঁপে কেঁপে ছায়া ফেলছে নোনা-ধরা দেয়ালে। মাকড়সারা বুনেছে অনেক জাল। জ্যাডভ পিপে থেকে মদ ঢালবে, টপ্‌ টপ্‌ করে পড়বে পাত্রে। বাতিটা হয়ত নিভে যাবে তার অলক্ষ্যে। "লিজা, লিজা!" দেয়ালে দেয়ালে জ্যাডভের ব্যাকুল ভয়ার্ত-কণ্ঠস্বর। তখন লিজা কোথায়? পচে গলে গেছে দেহ, শাদা হাড়গুলোর ওপর মাকড়সারা জাল বুনেছে। "লিজা, লিজা!" জ্যাডভ মূর্চ্ছিত। ওঃ, কি মজা! শুধু এই দিনের কল্পনা করে এলিজাবেথা ভুলতে পারে তার এই চরম দারিদ্র্য, জ্যাডভের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার।

"কি আমার পতিব্রতা স্ত্রী! কাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, সে খেয়াল আছে তোমার? এলিজাবেথা শুনলো, জ্যাডভ বলছে।

"আলু, আলু নেই?"

এলিজাবেথার স্বপ্ন জাল ছিঁড়ে গেছে। সে শিউরে উঠলো! আলু ··· সকাল থেকে তার খাওয়ার কথা একবারও মনে পড়েনি। সে দ্রুত পায়ে দরজার কাছে গেল।

"থাক, থাক তোমাকে আর যেতে হবে না," জ্যাডভের স্বর তিক্ত, "খাওয়ার কথা মনে থাকবে কেন? বসে বসে আজগুবি কল্পনার জাল বোন!"

"মদের বদলে পাশের বাড়ি থেকে কিছু রুটি আর আলু নিয়ে আসছি।" এলিজাবেথা লজ্জিত স্বরে বল্ল। "আগে শুনে যাও, এতদিন ধরে ভেবে ভেবে পৃথিবীতে পাপ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছি।"

জ্যাডভ গেলাসের মদটুকু নিঃশেষ করে একটা সিগারেট ধরালো। এলিজাবেথা সোফার কোণে বসেছে।

"সেদিনের কথা মনে পড়ছে। শত্রুর থেকে তিরিশ হাত দূরে বসে আছি ট্রেঞ্চে। কেন আমি ঝাঁপিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে তাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি, কম্বল, তামাক সবকিছু ছিনিয়ে নিলুম না? নিতাম, যদি জানতুম ওরা গুলি চালাবে না। সংগে সংগে কাগজে বেরুত আমার ছবি, বীর বলে পরিচিত হতাম। এখন যে নিশ্চিন্তে সাঁতুতে বসে মদ খাচ্ছি, কেন এখনই উঠে সহরে গিয়ে লুঠ-তরাজ বা খুন করছি না? কেন করছি না, শুনবে? ভয়, গ্রেপ্তারের ভয়, শাস্তির ভয়। তোমার কি মনে হচ্ছে আমি ঠিক বলছিনা? ঠিকই বলছি, পাপের সংজ্ঞা নিরুপণ করছে সরকার—তার জন্য আছে দেওয়ানি, ফৌজদারী দণ্ডবিধি। আচ্ছা, তুমি বলতে পার—শত্রু কে?"

"প্রথম শত্রু, আমাদের দেশের শত্রু," এলিজাবেথা মৃদুস্বরে বল্ল।

"বাজে কথা! স্বীকার করি, এই যুদ্ধে দলে দলে লোক সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে, জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে তারা প্রাণ দিচ্ছে। কিন্তু দেশের জন্য কি তারা প্রাণ দিচ্ছে? ভুল, ভুল! তারা প্রাণ দিচ্ছে নিজেদের গোপন হত্যা লালসা পরিতৃপ্তির জন্য। এতদিন সরকারের অনুশাসন যাকে দাবিয়ে রেখেছিল, যুদ্ধের সুযোগে সে বেরিয়ে এসেছে তার ভয়ংকর মূর্তিতে। চাই হত্যা, চাই নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা! জানো লিজা, বাঘের চেয়েও রক্তলিপ্সু এই মানুষজাতটা। রক্ত খেয়ে খেয়ে বাঘের হয়ত একদিন অরুচি ধরে যেতে পারে, কিন্তু মানুষের তা' ধরবে না। মানুষ যুগে যুগে মাতবে রক্তের হোলি খেলায়, শত পাপের নিষেধবাণী তাকে ফেরাতে পারবে না। তার ব্যক্তিত্বকে সে বিকশিত করে তুলবেই!"

জ্যাডভ উঠে পায়চারি করতে লাগলো।

"আইন? আইন পারবেনা এই ব্যক্তিত্বকে দাবিয়ে রাখতে, ফৌজদারী দণ্ডবিধি ভোঁতা হয়ে যাবে। লাখে লাখে লোক আজ যুদ্ধে মেতেছে। সামরিক শিক্ষায়

তারা শিক্ষিত, অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত, আজ যদি তাদের থামতে বলা হয়, তারা থামবে? না, না, তারা থামবেনা, থামতে পারে না। যুদ্ধ থামবে, আসবে বিপ্লব, পৃথিবীর বুকে জ্বলে উঠবে আগুন। হুকুমবরদার সৈনিকের দল সংগীন ফিরিয়ে আঘাত করবে তাদেরই বুকে—যারা একদিন তাদের হত্যার উৎসবে নামিয়েছিল। ভিখারীরা জুড়ে বসবে পৃথিবীর জারদের সিংহাসন। তারপর সাম্য—হাঁ স্বীকার করি, তারপর আসবে সাম্য। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তখনও মানুষ লড়বে। একদিকে জনগণের আইন, আর একদিকে ব্যক্তিত্ব, দুর্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিত্ব। সমাজতন্ত্রবাদী তোমরা, আইনের যোয়াল ঘাড়ে নিয়ে চলবে, আর আমবা, চিরবিদ্রোহী আমরা, লড়ব তোমাদেরই বিরুদ্ধে। আবার রক্তস্রোত বইবে, দলে দলে বিকশিত হবে ব্যক্তিত্ব।"

এলিজাবেথা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। গোধূলির আলোয় ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে একটি মানুষ, না, মানুষ নয়, এক দুর্দান্ত বন্য খাঁচায় পোরা পুমা। মুক্ত নয় বলেই ওর হৃদয়ে জ্বলছে আগুণ; চিরবিপ্লবের, চির ভাঙনের স্বর ওর কথায়। ওর কথা শুনতে শুনতে এলিজাবেথার চোখে ভেসে উঠছে মত্ত অশ্বের পদধ্বনি, খুরের ঘায়ে ঘায়ে স্ফুলিংগ ঠিকরে পড়ছে, স্টেপি ..মশালেব আলোয় আকাশ লাল,··· সে শুনতে পাচ্ছে অস্ত্রের ঝনৎকার, মৃত্যুর আর্তধ্বনি, স্টেপির যুগ যুগেব গান।

একুশ

উনিশশ' ষোলো সালের শীতের প্রথম দিকে রাশিযার ভাগ্য ফিরলো। রুশ সেনাবাহিণী এরজেরাম দখল করে বসলো। সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা। যুদ্ধের প্রতি সীমান্তে তখন মিত্রপক্ষেব বিপর্যয় চলছে। ইংরেজরা মেসোপটেমিয়া আর কনষ্টান্টি-নোপলের যুদ্ধে সুবিধে করে উঠতে পারছেন', ওদিকে পাশ্চাত্যে আইসের ফেরিতে ঘোরতর যুদ্ধ। এক বিঘৎ রক্ত-ভেজা জমি অধিকার করাও মিত্রপক্ষের কাছে তখন কম কথা নয়। ঠিক সেই সময়, প্রবল তুষার পাত তুচ্ছ করে, দুর্গম পথ ভেঙে রুশবাহিনী এরজেরাম দখল করে বসলো। সাড়া পড়ে গেল ইংলণ্ডে, রহস্যময় রুশদের নিয়ে বই লেখা হল। আঠারো মাস ব্যাপী যুদ্ধ, ধ্বংস, পরাজয়ের পর রাশিয়া আবার নববলে বলীয়ান হয়ে আক্রমণ করেছে। আবার মুষড়ে-পড়া সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিল প্রাণের হিল্লোল, ছেলে বুড়ো যত খামার ছেড়ে জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে এল। হাজার হাজার বন্দীরা পূর্ণ করলো রাশিয়ার জেলখানা। অষ্ট্রিয়া আঘাত সামলাতে পারলনা, নিভে গেল তার সাম্রাজ্য-কল্পনা। গোপনে সন্ধির প্রস্তাব জানালো জার্মানী, রুবলের দাম চড়লো। এক এরজেরামের সাফল্য বুঝি শান্তির জলপাইর পাতা মুখে করে এসেছে। রহস্যময় রুশ আত্মার গানে. পানোন্মত্ত হল্লায়. আর অশ্লীল শপথে

সালোণিকা, মার্সেঈ আর প্যারির পথ মুখর হয়ে উঠলো। য়ুরোপীয় সংস্কৃতি বাঁচাতে তারা চলেছে, রুশ আত্মার দল!

একটা সত্য তারা উপলব্ধি করলো এই আকাশ-ছোঁয়া প্রশংসা তারা মানুষ, তারাও অসাধ্য সাধন করতে পারে। তবে কেন তারা মুখ বুজে সইবে অপমান, আর অত্যাচার? নিজেদের অধিকার এবার তারা বিগলিত প্রার্থনায় মুড়ে ওপরওলার পায়ের তলায় ছুঁড়ে দেবে না, পিষিয়ে যেতে দেবে না। তারা কেড়ে নেবে, নিশ্চয়ই কেড়ে নেবে!

দেখতে দেখতে রুশ চাষীরা লাংগল ছেড়ে সৈন্যদলে নাম লেখালো, তারা ছড়িয়ে পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রে। মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া, তুরস্ক ও গ্যালিশিয়া মুখরিত হল তাদের পদভরে। জার্মানী ভয় পেল। আকাশে তার দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।

এবার মস্কোয়ে ভিড় নেই। বসন্ত এসেছে, বরফ গলে গেছে, সূর্যের আলোয় নতুন দিনের ইংগিত, তবু পথ জনহীন, যুদ্ধ যেন পাম্প করে নিঃশেষিত করেছে জনস্রোত। নিকোলাই মিনস্কে সামরিক কাজে নিযুক্ত। কাটিয়া আর ডাশার নিঃসংগ জীবন কাটছে। মাঝে মাঝে তেলেগিণের একটা চিঠি বিষাদের সুর নিয়ে আসে। তেলেগিণ পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। শত্রুরা তাকে এক দুর্গে বন্দী করে রেখেছে। অবিশ্যি ক্যাপটেইন রোশিন দেখা করতে আসেন রোজই। নিকোলাইর বন্ধু, এখানে যুদ্ধের কি একটা জরুরী কাজে এসেছে।

প্রতিদিন যখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে, বাইরের বেলটা বেজে ওঠে, কাটিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চা তৈরী করতে উঠে যায়। ডাশা বুঝতে পারে রোশিন এসেছে। তার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, কাটিয়া তবু ফিরে তাকায় না, চায়ের পেয়ালার ওপর চামচ দিয়ে অকারণ শব্দ করে। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে, বিষণ্ণ মিষ্টি হাসি। রোশিন ঝুকে পড়ে অভিবাদন জানায়, তারপর যুদ্ধের কথা, কাটিয়া চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে, শোনেনা। অসহিষ্ণু হয়ে রোশিন পা ঘসে। কখনও বা নেমে আসে সুদীর্ঘ নীরবতা, কাটিয়া হঠাৎ রক্তিম হয়ে ওঠে লজ্জায়, রোশিনের চোখদুটি তার মুখের ওপর! রাত এগারোটায় বিদায়ের পালা। রোশিন চুমু খায় কাটিয়ার হাতে, তার পর ডাশার হাতখানা নেড়ে দিয়ে চলে যায়। ধীরে ধীরে তার ভারী বুটের শব্দ মিলিয়ে যায়। কাটিয়া নিজের ঘরে চলে যায় দরজায় গা-তালার চাবী ঘোরাবার শব্দ।—নিত্য তিরিশ দিন এই একই খাতে বয়ে-যাওয়া জীবন।

সে দিন ডাশা জান্‌লার ধারে বসেছিল। বাইরে সূর্য্য ডুবছে, সোণালী কুয়াশা ঘনিয়ে এসেছে নগরীর বাড়িগুলোর ওপর। দূরে একটা অর্গান বাজছে, কে যেন

গাইছে গান: "আমি শুকনো রুটি চিবোলাম, বরফজল খেলাম।" গলা ছেড়ে গাইছে। ডাশা তাকিয়ে দেখলো, কাটিয়া ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কাটিয়া, কি চমৎকার গাইছে ভাই!"

"কি হবে গান গেয়ে?" কাটিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, "যুদ্ধ, যুদ্ধের বিষাক্ত নিশ্বাসে আমরা শুকিয়ে যাচ্ছি, ঝরে পড়ছি। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন কোথায় থাকব আমরা?" কাটিয়ার চোখ শুকনো, কিন্তু মণি দুটিতে জমে উঠেছে অশ্রুর মেঘ।

"এযুদ্ধ থামবে না, থামবে না! আমরা সবাই মরব। শুনছ না, ঐ গান? ও তো গান নয়, বুকের জমানো কান্না ঝরে ঝরে পড়ছে।"

"কাটিয়া, কাটিয়া! তোমার কি হয়েছে?" ডাশা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

বেল বাজছে, কাটিয়া দরজার দিকে তাকালো। রোশিন ঢুকছে ঘরে। তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে ডাশা খাবার ঘরে চা করতে গেল। সেখান থেকে সে শুনতে পেল কাটিয়ার স্বর। কেমন নিচু, আর ভারী!

"তুমি চলে যাচ্ছ?"

রোশিন কাসলো তারপর শুক্‌নো গলায়: "হুঁ।"

"কালই?"

"না, আজ, একঘণ্টা পরে।"

"কোথায়?"

"যুদ্ধে। কোথায় জানলেও বলতে নিষেধ।" কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর আবার শোনা গেল রোশিন বলছে: "কাটুসা, হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা, তাই আমি" ...

কাটিয়া তাকে বাধা দিলো। "না, না! আমি ... আমি জানি ..."

"কাটুসা!"

"তুমি যাও; আমি শুনব না, শুনতে চাই না।" কাটিয়ার স্বর হতাশায় ব্যাকুল।

ডাশার হাত কাঁপছে, চায়ের বাটিটা থেকে গরম চা হাতের উপর চল্‌কে পড়লো।

পাশের ঘরে সব চুপচাপ, মনে হয়, মুহূর্তগুলো মরে গেছে, তাদের হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এত স্থূল।

"ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন, ভাদিম পেট্রোভিচ," কাটিয়ার আকুল, অস্পষ্ট স্বর।

"বিদায়, তবে বিদায়," রোশিনের জুতোর মস্‌মস্ ... সদর দরজা খোলার শব্দ। কাটিয়া খাবার ঘরে এসে টেবিলের ওপর মুখ গুঁজে কাঁদলো।

সেই থেকে সে আর রোশিনের সম্বন্ধে কোনো কথা বলেনি। শুধু প্রতিদিন ভোরে ডাশা দেখেছে, তার ঠোঁট ফোলা, চোখদুটি লাল। হয়তো সারারাত কেঁদে কাটিয়েছে।

রোশিনের কাছ থেকে একটা চিঠি এল—দু-ছত্র লেখা। ডাশা চিঠি খানা ম্যানটেলপিসের ওপর রেখে দিল। সেখানে এখন ধূলো জমছে।

সেদিন ওরা দুবোন বিকেলে বুলেভারে বেড়াতে গেল। শ্রান্ত হয়ে বসলো একটা বেঞ্চে। ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে, ওয়ালৎসের একটা গৎ বাজছে, দু-একটি আহত সৈনিক, ক্রাচে ভর দিয়ে চলেছে। সূর্য ডুবলো এবার। ওয়াল্‌ৎসের বিষণ্ণ সুর ছড়িয়ে পড়ছে। ডাশা কাটিয়ার হাতখানা চেপে বল্ল, "কাটিয়া, আমাদের সহিষ্ণু হতে হবে। শত দুঃখ এলেও আমরা মুখ বুজে সয়ে যাব, তারপর একদিন যুদ্ধ থেমে যাবে। সেদিন আবার নতুন করে আমরা ভালোবাসব, সংসার পাতব।"

"ডাদুশা, সে আশা আমার নেই," কাটিয়া হতাশায় ভেংগে পড়লো, "আমি জানি তুমি সুখী হবে, কিন্তু আমার সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে। আমি তাকে বিদায় দিয়েছি।"

"ছি, অমন কথা বলোনা। আমাদের বুক বাঁধতে হবে।"

ওরা এখন রোজই বুলেভারে বেড়াতে যায়। সেখানে একদিন বেসনভের সংগে দেখা। সেদিনও ওরা বেঞ্চে বসে সূর্যাস্ত দেখছিল, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠেছে ··· ওয়ালৎসের তেমনি করুণ সুর, একটি লোক এসে বসেছে ওদের বেঞ্চে! ডাশা অনুভব করলো, সেই আবছা অন্ধকারে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে! কি তীব্র তার দৃষ্টি, চামড়ার নীচে জ্বালা ধরিয়ে দেয়! ডাশা লোকটার দিকে তাকালো, কে লোকটা? বেসনভ, বেসনভ! ডাশা চমকে উঠলো।

আরো রোগা হয়ে গেছে বেসনভ, পোষকটা গায়ে ঢলঢল করছে, মাথায় রেডক্রস আঁকা টুপি। বেসনভ কাছে এসে ডাশার কর মর্দন করলো।

"কেমন আছেন?" ডাশা বল্ল। কাটিয়া ডাশার টুপির আড়াল থেকে একবার বেসনভকে দেখে চোখ বুজলো। বেসনভের গায়ে গন্ধ, অনেক দিন স্নান হয়নি।

"কালও বুলেভারে আপনাদের দেখেছি, বেসনভ বল্ল, "কিন্তু কথা বলবো কিনা ঠিক করতে পারছিলাম না।··· আমিও যুদ্ধে চলেছি—ওরা আমাকেও রেহাই দিলে না।

"যুদ্ধে যাচ্ছেন কে বল্ল,—আপনি ত রেডক্রসে—"

"ঐ একই কথা," বেসনভ হাসলো, "হত্যা আর সেবা—দুটোই বিশ্রী, সমান একঘেয়ে ডারিয়া দিমিত্রিভ্‌না।

"আপনার কি খুব বিশ্রী লাগছে," কাটিয়া টুপির আড়াল থেকে বল্ল।

"হাঁ, খুব বিশ্রী। শুধু মৃতের স্তূপ আর স্তূপ। আমরা নিজেদের সভ্য বলে জাহির করি, সংস্কৃতির গর্বে আমরা অন্ধ হয়ে যাই—কিন্তু অতবড় মিথ্যে অলীক কল্পনা তো আর নেই! আর একদিকে বাস্তবতার কোনো বিলাসিতা নেই, কল্পনার মেঘ সে

সৃষ্টি করে না। সেখানে শব জমে ওঠে, রক্তে ভিজে যায় মাটি, বিশৃঙ্খলা তার নিয়ম। ডাবিষা দিমিত্রিভ্না, আপনি কি আমার জন্য আধ ঘণ্টা ব্যয় করতে রাজি আছেন?"

"কেন?" ডাশা তার মুখের দিকে তাকালো। রোগজর্জর মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। তার মনে হল এমুখ সে দেখেনি, এ লোককে সে চেনে না।

"ক্রিমিয়াব সে-রাতের কথা আপনি ভুলতে পারেন নি বোধ হয়?" বেসনভ মৃদু হাসলো, "আপনি যে ভুল বুঝেছিলেন সেই কথাই আপনাকে জানাতে চাই।"

সে তাকিয়ে দেখলো, সেই মুখ, কথায় তেমনি উৎসারিত হচ্ছে মোহ-বিচ্যুত যুগের নিরাশা, তবু কোথায় সে জ্বালা, কোথায় সে দুরন্ত ঝটিকা যা সবকিছুকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে?

"শুধু আধ ঘণ্টা আপনার নষ্ট করবো।"

"না, আমি আপনার জন্য এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করতে রাজি নই, আপনি চলে যান।" ডাশা চিৎকার করে উঠলো।

বেসনভ একটু হেসে বিদায় নিল। ডাশা দেখলো, ধীরে ধীরে সে চলেছে দীর্ঘ দেহ টেনে, এখুনি হয় ত ভেঙে পড়বে—এই কি সেই বেসনভ, যে আসত পিটার্স্‌বুর্গের ঝড়ো রাতে তার নিভৃত স্বপ্নে?

"কাটুসা, একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি ফিরে আসছি।" ডাশা ছুটে গেল বেসনভের কাছে।

"আপনি কি রাগ করেছেন?"

"রাগ, কেন রাগ কববো বলুন ত? আপনিই ত—"

"আমি আপনাকে এখনো ভালোবাসি," ডাশার বুকে ঝড় উঠেছে, "হাঁ এখনো ভালোবাসি—সে কথা বলতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু অতীতকে আমি ভুলে যেতে চাই, ভুলে যেতে চাই ক্রিমিয়ার সেই বাত আব আপনাকে ··· আপনি আব আমার পথে এসে দাঁড়াবেন না।"

ডাশা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"দিমিত্রিভ্না, হয় তুমি দেবী," বেসনভের স্বর গম্ভীর "নয় তো সয়তানী! ··· কতদিন মনে হয়েছে ··· নরকের অমানুষিক যন্ত্রণা এসেছে আমাকে পুড়িয়ে মারতে তোমারই মূর্তি ধরে। তবু ত আমি তোমাকেই চেয়েছি।"

বেসনভ পা বাড়ালো, চলবার শক্তি তার শেষ হয়ে গেছে। ডাশা দাঁড়িয়ে আছে মুখ নিচু করে। তার নুয়ে পড়া ঘাড় অম্লান কাগজের মত শাদা, শাদা পোষাকের আড়ালে অনাঘ্রাত ফুলের মত দুটি স্তনের শুভ্র আভাস, বেসনভ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। তার মনে হল ওখানে আছে মৃত্যু, রক্তে রক্তে সে প্রতি রাতে যাকে

অনুভব করে। বেসনভ শিউরে উঠলো। ডাশা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে, গাছের আড়ালে ওর সোণালী চুলের গোছা এখনো দেখা যায়। ডাশা একবারও ফিরে তাকালো না। বেসনভের পায়ের নিচে মাটি ধ্বসে যাচ্ছে, তার শেষ আশ্রয় মাটি। একটা গাছ আঁকড়ে ধরলো বেসনভ।

বাইশ

বনের ভেতর দিয়ে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। আকাশে চাদ, চারদিক নিঝুম। বেসনভ গাড়িতে শুয়েছিল। রোজ রাতে তার জ্বর আসে, শীতে থর থর করে কাঁপে, দাঁতে দাঁত লেগে যায়। বেসনভ কম্বলটা ভালো করে গায়ে টেনে দিল। ওপরে বিবর্ণ আকাশে কুয়াশার ভেতরে চাঁদ উঁকি মারছে। যাত্রা শেষ হয়ে এল। কুয়াশা, চাঁদ, গাড়িটা হোঁচট খেতে-খেতে চলেছে; অব্যক্ত ধ্বনি চাকায় চাকায়। চাঁদ, কুয়াশা, চাকার অব্যক্ত ধ্বনি, আবার চাঁদ …। অতীত এখন স্বপ্ন! পিটার্স বুর্গের আলোকিত রাত, দৈত্যের মত বিরাট বাড়ির সার, বরফ, ধোঁয়া, কারখানার সাইরেণ, নাট্যশালার সুডৌল পায়ের সার; ঝোড়ো রাতে নিভৃত শয্যায় বিছানায় এলিয়ে পড়া নগ্ন মেয়ে, চুল উপচে পড়ছে, কালো রেশমের মত চুল, … কালো চোখের মর্মভেদী কটাক্ষ-সন্ধান। যশ … আবছা আলোয় সৃষ্টি, যশের পাকা সড়ক তৈরি … এক শাদা পোষাক-পরা মেয়ে এল ভেসে তার অন্ধকার ঘরে, তার জীবনে … সবইত স্বপ্ন। গাড়িটা দুলছে … একটা চাষা গাড়ির সংগে সংগে চলেছে: দুহাজার বছর ধরে ও অমনি চলেছে গাড়ির পাশে পাশে। … অনন্ত, অফুরন্ত কাল, চাঁদের আলো আর কুয়াশায় ঘেরা। ‥ শতাব্দীর অন্ধকার থেকে উঠে আসছে কারা? গাড়ির চাকা কুমারী মাটি চষে চলেছে। কুমারী মাটি? না, না হুনরা এসেছে, ধর্ষিতা মাটি; কুয়াশায় আবছা দেখা যাচ্ছে দগ্ধ-গাছের সার, ধোঁয়া উঠছে। আকাশ চিরে একটা শব্দের তীর ছুটে এল কাছে, তারপর একটা বিরাট হুংকার। …

বেসনভ উঠে বসলো। গাড়ি থেকে সবাই নেমেছে। বেসনভ নামতে যাবে এমনি সময় এক ঝলক আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বেসনভের মনে হল নরকের অন্ধকারে সে তলিয়ে যাচ্ছে … তলিয়ে যাচ্ছে …

উড়ো জাহাজ দ্বিতীয়বার বোমা ফেলে চলে গেল, আর শোনা যায়না তার ইঞ্জিনের শব্দ। ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে! এখানে ওখানে আগুন জ্বলছে, মানুষ আর ঘোড়ার রক্তাক্ত কবর। বেসনভের গাড়ি উল্টে পড়েছে খালের মধ্যে, খড়ের গাদা, শস্যের বস্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে গোঙাচ্ছে।

বেসনভ খড়ের গাদার ভেতর থেকে বহু চেষ্টায় বেরিয়ে এল, এবার বনের পথ ধরবে, সেনানিবাস ঐ দিকেই। সে চলতে পারছেনা, মাঝে মাঝে গাছের গুঁড়ি বা পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম করে নিচ্ছে।

মধ্য আকাশে চাঁদ। পথ একে-বেঁকে চলেছে, জলাভূমির বুকে কুয়াশা।

বেসনভ আপন মনে বল্ল: ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এল, নইলে যুদ্ধে আমার কি প্রয়োজন? এবার ওদের প্রয়োজনও ত ফুরিয়ে গেছে। এবার চল অপদার্থ কবি, চল। ইচ্ছে হয় ফুঁসে ওঠ ক্রোধে, চিৎকার কর! চল, জলাভূমিতেই হবে তোমার সমাধি …

একটা ধূসর ছায়া জলার ভেতর থেকে এল। মেরুদণ্ডের ভেতরে একটা ঠাণ্ডা ভয় নামছে। বেসনভ হেসে উঠলো, অর্থহীন কতগুলো শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। কারা যেন তাকে অনুসরণ করছে। বেসনভ পেছন ফিরে দেখলো একটা কুকুর তার পেছনে,—একটা নয়, এক সারে পাঁচটা! বেসনভ একটা পাথর ছুঁড়ে মারলো। কুকুরগুলো ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল।

এবার গাছ পালা দেখা যাচ্ছে পথের পাশে। বেসনভ একটা মোড় ঘুরতেই দেখতে পেল, গাছের আড়ালে একটা ছায়ার মত কে দাঁড়িয়ে আছে।

বেসনভের বুক কেঁপে উঠলো অজানা ভয়ে, শক্তি নেই, তার আর চলবার শক্তি নেই। পেছনের কুকুরগুলো কাছে এসে পড়েছে, লক্ লক্ করছে তাদের জিভ। ছায়াটা নড়ছেনা। চাঁদের ওপর স্বচ্ছ মেঘের আবরণ। একটা তীক্ষ্ণ শব্দ তার মগজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেল। ছায়া মূর্ত্তির পায়ের চাপে একটা ডাল ভাঙলো বোধ হয়। বেসনভ আর সহ্য করতে পারলো না, এগিয়ে গেল মূর্ত্তির কাছে। সৈনিকের ইউনিফর্ম পরা একটা লোক, মুখ মরার মত শাদা! বেসনভ চিৎকার করে উঠলো:

"কোন দল?"

"দুনম্বর ব্যাটারী।"

"আমাকে ছাউনিতে নিয়ে চল।"

সৈনিক বেসনভের দিকে তাকিয়ে দেখলো।

"ওরা—তোমার পেছনে?"

"কুকুর।"

"না, না, কুকুর নয়।"

"চল, আমাকে নিয়ে চল, ছাউনিতে।"

"না।"

"আমার জ্বর এসেছে, আমাকে নিয়ে চল, তোমাকে টাকা দেব।"

"আমি দল ছেড়ে দিয়েছি।" সৈনিক ধীরে ধীরে বল্ল।

"এখুনি তারা আমাকে ধরে ফেলবে।"

বেসনভ পেছনে তাকালো। কুকুরগুলো মিলিয়ে গেছে। কাছেই গাছের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে হয়ত।

"ছাউনি কি খুব দূরে ?"

সৈনিক নিরুত্তর। বেসনভ চলতে শুরু করলো। পেছন থেকে সাঁড়াশির মত কার হাত তাকে আঁকড়ে ধরেছে!

"তোমাকে যেতে দেব না।"

"হাত ছাড়।"

"ছাড়বো না!" সৈনিক বল্ল "তিনদিন পেটে একটা দানা পড়েনি ··· ঘরের ভেতরে বসে ঝিমিয়ে কাটিযেছি রাত আর দিন। ওরা পাশ দিয়ে চলে গেছে ··· একটা দুটো নয়, লাখে লাখে ঐ অশরীরী সয়তানের দল, লক্‌লক্ করছে তাদের জিভ, রক্তলিপ্সা ঝড়ে পড়ছে।"

"কি বাজে বকছ।" বেসনভ হাত ছাড়িয়ে নিল।

"সত্যি, ঠিকই বলছি, তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে।"

বেসনভ দৌড়ালো প্রাণপণে, পেছনে ভারী বুটের শব্দ। দৌড়াতে পারছে না, ঘন ঘন নিশ্বাস পরছে, পা দুটো অসার হয়ে এসেছে। পেছন থেকে সৈনিক তাকে জড়িয়ে ধরলো। বেসনভ মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। সৈনিক ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর, মোটা আংগুলগুলো দিয়ে পীড়ণ করছে তার গলা, পীড়ণ করছে ...

কালো পর্দা নেমে আসছে চোখে, শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ গেছে থেমে। আসছে, আসছে রাতের আঁধারে যার ছায়া দেখে বার বার সে চমকে উঠত। ··· সৈনিক অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ালো। মনে মনে বল্ল, "এখন কোথায় যাব? লোকটা মরে গেল। এত ঠুনকো মানুষের প্রাণ!"

তেইশ

জেল, বন্দীরা নাম দিয়েছে ভাগাড়। ভাগাড়ই বটে!

কাঁটাতার ঘেরা প্রকাণ্ড কুৎসিৎ বাড়িটা জলার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ; সরু রেলের লাইন জলার ভেতর দিয়ে চলে এসে থেমে গেছে তারই গায়ে। দূরে ন্যাড়া পাহাড়টা দাঁত বার করে যেন আকাশকে ভ্যাঙচাচ্ছে। পচা গরম জলার ভেতর থেকে ভ্যাপসা গরম ওঠে, ডাশগুলো ভন্‌ভন্ করে সারাদিন, সূর্যের ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে পড়ে। ভাগাড়ের পচা ক্রিয়া চলে রাতদিন।

তেলেগিণ এখানে বন্দী। আরো হাজার হাজার বন্দী আছে। এই বিষাক্ত আবহাওয়ায়, অপর্যাপ্ত খাবার খেয়ে সবাই ভুগছে—হয় ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে, নয়ত ফোড়ায় কিম্বা পেটের গোলমালে। তবু তারা নির্জীব হয়ে পড়েনি। এখনও আশা আছে, এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তির দিন এগিয়ে আসছে। ব্রুসিলভ এগোচ্ছেন তার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল নিয়ে, ফরাসীরা শাম্পেনে আর ভার্দুনে জার্মানদের হটিয়ে দিয়েছে, তুর্কীরা ছেড়ে গেছে এসিয়া মাইনর। যুদ্ধ শেষ হতে আর দেরী নেই—এই গ্রীষ্মেই মিত্রপক্ষ জিতবে, তারপর শান্তি।

গ্রীষ্ম চলে গেল, বর্ষা এল। ব্রুসিলভের সৈন্যদল ক্রাকৌ বা লভভ অধিকার করতে পারলো না, ওদিকে ফরাসী সীমান্তে ঝিমিয়ে এসেছে যুদ্ধ: শত্রু-মিত্র যুদ্ধে ঢিলে দিয়ে নিজেদের ঘা চাটছে। হেমন্তে হয়তো শেষ হবে যুদ্ধ।

'ভাগাড়ে'র বন্দীরা এবার নিরাশ হয়ে পড়লো। বৃষ্টিধারার সংগে সংগে নেমে আসছে হতাশা, মুছে গেছে মুক্তির স্বপ্ন। তেলেগিণের পাশে থাকে ভিস্‌কভ। হঠাৎ সে দাড়ি-কামানো, স্নান, সব ছেড়ে দিয়ে বিছানা নিল। কথা বলে না, চুপ করে সারাদিন সে শুয়ে থাকে। একদিন রাতে সে তেলেগিণকে শুধালো।

"তেলেগিণ, তুমি বিয়ে করেছ?"

"না"

"আমার স্ত্রী আর একটি ছোট মেয়ে আছে। তুমি এখান থেকে বেড়িয়ে তাদের সংগে দেখা কোরো।"

"ঘুমোও বন্ধু, মন খারাপ করে কি হবে?"

"ঘুমোব, কাল থেকে এমন ঘুমোব—"

পাগলের মত হেসে উঠলো ভিসকভ।

পরদিন ভিস্‌কভকে পাওয়া গেল পাইখানায়, একটা সরু চামড়ার ফিতে গলায় দিয়ে ঝুলছে। হৈ-চৈ পড়ে গেল। বন্দীরা তার মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়ালো, কারো মুখে কথা নেই, লণ্ঠনের আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছে ভিস্‌কভের বিকৃত মুখে, থম্‌থমে নীরবতা ঝড়ে পড়ছে। হঠাৎ লেফটেনাণ্ট মেলশিন চিৎকার করে উঠলো:

"ভাইসব, তোমরা কি এর পরেও মুখ বুজে থাকবে?"

"বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল:

"না, আমরা মুখবুজে সইব না।"

"ওরা ভিস্‌কভকে হত্যা করেছে!"

"এই অত্যাচার কতদিন মানুষ সইতে পারে?"

"আমিও একদিন অমনি করে গলায় দড়ি দেব।"

"আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হোক!"

"আমরা ত আর সাধারণ কয়েদী নই।"

"চুপ, চুপ!" জেলখানার অধ্যক্ষের বাজখাঁই গলা শোনা গেল, "চুপ না করলে মুখ বন্ধ করবার দাওয়াই আমার জানা আছে। চুপ, চুপ, রুশকুকুরের দল!"

"কি, কি বল্ল?"

"রুশকুকুর, আমরা রুশকুকুর?"

জুকভ অধ্যক্ষের সমুখে এগিয়ে গেল।

"রুশ কুকুর বলার কি শাস্তি তা তুই জানিস? না, জানিস না?"

জুকভ ঝাঁপিয়ে পড়ে অধ্যক্ষের টুটি টিপে ধরলো; তখনও সে দাতে দাঁত ঘসছে: "রুশকুকুর, রুশকুকুর!"

অধ্যক্ষ চিৎকার করছে: "বাঁচাও, বাঁচাও!"

ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে, রক্ষীরা এবার এসে পড়বে। তেলেগিণ জুকভের ঘাড় ধরে তাকে অধ্যক্ষের কাছ থেকে টেনে নিয়ে এল। জুকভ তখনো হাঁপাচ্ছে আর চিৎকার করছে: "ছেড়ে দে, আমাকে ছেড়ে দে! রুশকুকুর, রুশকুকুর!" জেলের অধ্যক্ষ উঠে দাড়িয়ে একবার তেলেগিণ, মেলসিন আর জুকভের দিকে তাকালো, মনে হল তাদের মুখ সে চিনে রাখছে, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

সেদিন বন্দীদের নাম-ডাকা হল না, ঘণ্টা পড়লো না, কফির সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। দুপুরের দিকে স্ট্রেচারে করে ভিস্কভের মৃতদেহ নিয়ে সৈনিকরা চলে গেল। সব চুপচাপ। বন্দীরা শুয়ে পড়েছে যে যার বিছানায়। সবাই তারা জানে বিদ্রোহের কি ফল? কোর্ট মার্শাল—মৃত্যু।

তেলেগিণ তার বিছানায় খুলে বসেছে জার্মান ব্যাকরণ। খিদেয় পেট জ্বলছে, অক্ষরগুলো আবছা হয়ে আসছে।

"কোর্ট-মার্শালে প্রমাণ করব আমি পাগল।"—জুকভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তেলেগিণ তাকিয়ে দেখলো, জুকভের মাথা এলিয়ে পড়েছে, ভয়ে মুখ শাদা। ভোরের সে উত্তেজনা এখন আর নেই।

"কেন যে ঐ হতভাগাটার টুটি টিপে ধরলাম! আমাকে একা নয়, ওরা সবাইকে শাস্তি দেবে। আমি পাগলের ভান করব, ঠিক করেছি।"

"কি হবে ভান করে?" তেলেগিণ ব্যাকরণখানা রেখে দিল, "ওরা এই সুযোগ ছাড়বে ভাবছ?"

"ছাড়বে না তা জানি।"

"পাগলের ভান করা তাহলে বৃথা, কি বল?"

"হাঁ, কিন্তু—"

"জুকভ, ভাই, তোমাকে আমরা দাযী করব না। তবে একটা কুকুরের টুঁটি টিপে ধরার দাম দিতে হবে অনেক বেশি।"

"ঈশ্বর করুন, সে দাম যেন একা আমাকেই দিতে হয়।"

দরজা খুলে গেল, সার্জেণ্ট-মেজর, দুজন সৈন্য সংগে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

"জুকভ, মেলসিন, আইভানভ, উবেইকো, তেলেগিণ!" কর্কশ কণ্ঠে ধ্বনিত হল।

সবাই উঠে দাঁড়ালো বিছানা ছেড়ে। অন্যান্য বন্দীরা নীরব। সৈন্য দুজন তাদের নিয়ে চললো, বাইরে উঠোনে একটা প্রকাণ্ড গাড়ি থেমে আছে, একজন রক্ষী পাহারা দিচ্ছে। তেলেগিণ মেলসিনকে ফিস্‌ফিস্ করে বল্ল, "গাড়ি চালাতে জান?"

"হাঁ জানি, কেন বল ত?"

"এই চুপ!"

জেলের সেনানাযকের কক্ষ। বিচারকরা টেবিলের চার ধারে গোল হয়ে বসেছেন। বন্দীরা এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। জেলের অধ্যক্ষ বসে আছে এক পাশে। তেলেগিণ বাইরের দিকে তাকিযে ছিল, সে শুনতে পেল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী হচ্ছে:

"... মৃতদেহ দেখতে রুশবন্দীরা ছুটে এল। কয়েকজন বন্দী এই সুযোগে সবাইকে উত্তেজিত করছিল। বন্দীরা এবার কুৎসিত গালাগাল দিতে শুরু করলো। ঘুষি উঁচিযে সবাই এগিযে এল, কয়েদী মেলসিনের হাতে একখানা ধারালো ছুরি ..."

গাড়ির চালক টুপিটা মুখের ওপর নামিযে দিযে শুযে পড়েছে। দুজন সৈনিক কাছে আসতেও সে একটু নড়লো না। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়! তেলেগিণ অসহিষ্ণু হযে উঠলো। কাণে আসছে:

'এবার জুকভ, জুকভের উদ্দেশ্য ছিল, অধ্যক্ষকে খুন করে জেল ভেঙে বেরিয়ে আসা, আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন, আইনের চক্ষে কত বড় অপরাধ সে করেছে।"

জেলখানার অধ্যক্ষ এবার জার্মান ভাষায় অনর্গল কি বলে গেল, তেলেগিণ বুঝতে পারলো না।

"... তেলেগিণের কথা বলছি। তেলেগিণ জুকভকে ছাড়িয়ে দিল সত্য, কিন্তু সৎ উদ্দেশ্যে যে নয় একথা আমরা একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারি। সে দু-দুবার পালাবার চেষ্টা করেছে জেল ভেঙে ..."

বিচারক তেলেগিণকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা কি সত্য?"

"না।"

"তোমার কিছু বলবার আছে এ সম্বন্ধে?"

"এই অভিযোগ আগাগোড়াই মিথ্যে।" অধ্যক্ষ লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।

বিচারক তাকে ইংগিতে বসতে বল্লেন।

"তেলেগিণ, আর কিছু বলতে চাও?"

"না।"

"জুকভ, মেলসিন, তোমরা?"

সবাই মাথা নাড়লো। বিচারক আসন ছেড়ে পাশের ঘরে গেলেন।

"গুলি চালাবার হুকুম হবে নিশ্চয়ই।" তেলেগিণ নিচু গলায় বল্ল, তারপর রক্ষীর দিকে: "এক গেলাস জল খাওয়াতে পার?"

রক্ষী বন্দুকটা টেবিলে ঠেস দিয়ে রেখে জল আনতে গেল।

তেলেগিণ মেলসিনের কানে কানে বল্ল, "ওরা যখন বাইরে নিয়ে যাবে, গাড়িটা স্টার্ট দিতে চেষ্টা করো।"

"আচ্ছা!"

বিচারক ফিরে এসে এবার রায় দিলেন: "তেলেগিণ, জুকভ, আর মেলসিনকে গুলি করে মারা হবে।"

তেলেগিণ জানতো, এই তাদের ভাগ্য, তবু মাথাটা যেন ঘুরছে, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে! জুকভের মাথাটা ঝুলে পড়েছে, মেলসিন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে।

বিচারকের স্বর কানে এল: "সেনানায়কের ওপর বন্দীদের প্রাণদণ্ডের ভার দেয়া হল।"

বিচারক উঠলেন। সেনানায়ক কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে হুকুম দিলেন, "বন্দীদের নিয়ে চল।"

তেলেগিণ বাইরে এল, তার সামনে চলেছে জুকভ, মেলসিন আর প্রহরী। মেলসিন হঠাৎ আঁকড়ে ধরলো প্রহরীকে। সে গোঙাচ্ছে, সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেছে যন্ত্রণায়। প্রহরী কি করবে ভেবে পেল না। দেখতে দেখতে মেলসিন তাকে গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেল, তারপর গাড়ি স্টার্ট দেবার হাতলটা সজোরে ঘুরিয়ে দিল। ইঞ্জিনটা শব্দ করে উঠলো, একটা খাঁচায়-পোরা জন্তু যেন! চালকের ঘুম ভেঙে গেছে, চিৎকার করে সে লাফিয়ে পড়লো গাড়ি থেকে। ও-দিকে দ্বিতীয় প্রহরীকে জড়িয়ে ধরেছে তেলেগিণ।

"জুকভ, রাইফেলটা কেড়ে নাও।" তেলেগিণ প্রহরীকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে, তারপর এক লাফে গাড়ির কাছে এল। মেলসিনের সংগে প্রথম প্রহরীর ধস্তাধস্তি চলছে। তেলেগিণের এক ঘুষি খেয়ে প্রথম প্রহরী ঘুরতে ঘুরতে পড়ে

গেল। তারা তিনজন গাডিতে চেপে বসলো। ইঞ্জিন এবার গর্জন করছে, গাড়িব চাকায় ভ্রষ্ট তারার গতিবেগ। শাঁ শাঁ করে চলেছে মাথার ওপর দিযে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। বন্দুক-ওচানো সৈনিকের দল, বিন্দুর মত ছোট হয়ে এল; এখনও দেখা যাচ্ছে সেনা-ছাউনিটাকে—খেলাঘরের মত। বাঁক ঘুরলে আর দেখা যাবে না। গাডি ছুটে চলেছে। চাকার ঘায়ে ঠিক্‌রে পড়ছে পাথর। ঠুঁটো পাইনের বন, কবন্ধের মত এক একটা পাহাড ছুটে পালিযে যাচ্ছে। গর্জন, ইঞ্জিনের গর্জন—মত্ত দানবের বুকের ধুক্‌ধুক্‌ শব্দ ···

তেলেগিণ চিৎকার কবে বল্ল, "মেলসিন, ব্রীজের দিকে চালাও!"

দশদিন পরে তেলেগিণ গ্যালিশিযা সীমান্তে এসে পৌছালো। জুকভ আর মেলসিন গেছে রুমানিয়ার দিকে। এ-কদিন সে দিনেব বেলা ঘুমিয়েছে, বাতে পথ চলেছে। তারা-ভবা আকাশেব দিকে চেযে চেয়ে বন-পাহাড়, আব ভস্মীভূত গ্রামের নির্জন পথ দিযে চলতে চলতে ভেবেছে ডাশার কথা। ডাশা, ডাশা কি তাকে এখনও ভালোবাসে?

বৃষ্টি পড়ছে। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীগুলো পথ জুডে আছে, গৃহহীন নাবী, শিশু আর বৃদ্ধ অন্ধকারে এখানে ওখানে সংসাব পেতে বসেছে। একদল সৈনিক মার্চ করে চলে গেল।

উনিশ-শ চৌদ্দ আর পনেবো সাল শেষ হয়ে গেছে, উনিশ-শ ষোল ও শেষ হযে এল, এখনও অ্যাম্বুলেন্স গাডী এবড়ো খেবডো পথ কাঁপিযে যাচ্ছে, এখনও ভস্মীভূত গ্রামের অধিবাসীরা কাতারে কাতারে চলেছে।

যুদ্ধ কবে শেষ হবে কে জানে!

জোরে বৃষ্টি নেমেছে তেলেগিণ পথের পাশে একটা ভাঙা গীর্জায় আশ্রয নিল।

বেদীর ওপর শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিল তেলেগিণ। পচা পাতাব মিষ্টি গন্ধে ঝাপসা হয়ে এসেছে তার চেতনা ···। চোখ ঘুমে ভারী; একটা চলমান আবছা ছায়া যেন ভেসে উঠছে—কার স্বাপ্নিক মূর্তি! ডা-শা, ডা-শা! ঘুম পাতলা হয়ে এল, স্পষ্টতর হয়ে উঠছে চাকার শব্দ, তেলেগিণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে বসলো। বেদীর ওপর কুমারী মেরী মা—কাঠের মুখ, বিকৃত হয়ে গেছে কালের দাপটে; আশীর্বাদের ভংগীতে তোলা হাতের আধখানা নেই।

তেলেগিণ বেরিয়ে এল। গীর্জার সিঁড়িতে একটি মেয়ে বসে আছে, কোলে কম্বলে ঢাকা একটি শিশু। ওকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি তাকালো, অশ্রুসিক্ত মুখ!

"একবার কেঁদে উঠে ও চিরদিনের মত চুপ করে গেছে।" মেয়েটি তেলেগিণকে বল্ল।

"আমার সংগে চল। আমি ওকে কোলে নিচ্ছি।"

"না, তুমি যাও। আমি এখানে বসে থাকব। আমার খোকা!" মেয়েটি বুকে চেপে ধরলো মৃত সন্তান।

তেলেগিণ একটু দাঁড়ালো, টুপিটা টেনে দিল চোখের ওপর, তারপর নেমে এল পথে। দু-জন জার্মান পুলিশ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলো। তেলেগিণকে দেখতে পেয়ে তারা ঘোড়ার রাশ টানলো।

"এদিকে এস।"

তেলেগিণ কাছে গেল।

"রুশ!"

দুজন পুলিশ ঘোড়া থেকে নেমে তেলেগিণকে চেপে ধরলো। তেলেগিণ পালাবার কোনো চেষ্টা করলো না, তার মুখে হাসি। আবার সে বন্দী!

একটা গাড়ির আস্তাবলে তেলেগিণকে পুরে তালা বন্ধ করে ওরা চলে গেল। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বন্দুকের শব্দ। দেয়ালের ফাটল দিয়ে আগুনের ঝলক দেখা যায়। তেলেগিণ একটা খড়ের গাদার ওপর শুয়ে পড়লো, ঘুম আসে না। কাছেই কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে। স্পষ্টতর হয়ে এসেছে শব্দ, আগুনের ঝলক চোখের সমুখে নেচে বেড়াচ্ছে। তেলেগিণ উঠে বসে কান পেতে শুনলো এবার আরো কাছে, দেয়াল কাঁপছে, একটা রাইফেলের গুলি ফাটলো শেডের কাছে। অনেক কণ্ঠ চিৎকার করছে, একটা মোটর ইঞ্জিনের গর্জন; মাটি কাঁপিয়ে চলেছে হাজার হাজার সৈনিক। মটরের মত কি যেন ছিটিয়ে পড়ছে ছাদের ওপর। তেলেগিণ ফাটলে চোখ রেখে দেখতে চেষ্টা করলো। বারুদের গন্ধ নাকে এসে লাগছে, ঝিম্ ঝিম্ করছে মাথা। অনেক পায়ের শব্দ … হাত-বোমা ফাটছে … আর্তনাদ, চিৎকার … তারপর সব চুপ। … কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো: "আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।"

ভাঙা, চির-খাওয়া দরজার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল, মাথার ওপর হাত তুলে কারা ছুটছে। অশ্বারোহী সৈন্যরা তাড়া করেছে তাদের পেছনে। এক-জন অশ্বারোহী ঠিক দরজার পাশে, হাতে তরোয়াল, টুপি খসে পড়েছে মাথা থেকে।

"উদ্ধার কর, আমাকে উদ্ধার কর!" তেলেগিণ চেঁচিয়ে উঠলো।

"কে, কে চেঁচায়?" অশ্বারোহী চারদিকে তাকালো।

"এই যে আমি, এখানে, এই ঘরে।"

অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লো। বন্ধ দরজা ভেঙে পড়ছে তার তরবারির আঘাতে।

"তেলেগিণ! কে ভেবেছিল তুমি এখানে!" অশ্বারোহী হাসলো।

তেলেগিণ তার দিকে তাকালো, "আমি ত আপনাকে চিনতে পারছি না।"

"চিনতে পারছ না? আমি স্থাপজকভ।"

চব্বিশ

মস্কো পৌছাতে এখনও এক ঘণ্টা দেরি। ট্রেন ছুটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে গাছপালা, ঝিমিয়ে পড়া বাংলোগুলো, ছোট ছোট ডোবা, পাতা-বেছানো পথ-রেখা। একটা ছোট স্টেশন এসে পড়লো। দুটি সৈনিক, তাকিয়ে আছে গাড়ির দিকে, কাঁধে ঝুলি, একটি মহিলা প্লাটফরমে ঘুরছেন। গাছপালা এবার কমে আসছে, শহরতলির সার সার বাড়ি দেখা যায়, দূরে মেঘাচ্ছ আকাশের নিচে গীর্জার গম্বুজ—ঐ মস্কো।

তেলেগিণ বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। শেষ হয়ে এসেছে যাত্রা, দীর্ঘ দু বছরের আশা আজ মিটবে। এখন কটা? দুটো বাজেনি। আড়াইটেয় দরজার ইলেট্রিক বেলটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠবে, তারপর ওক কাঠের ভারী দরজাটা খুলে যাবে, কার নীল পোষাকের প্রান্ত না?

মস্কো স্টেশনে গাড়ি এসে গেছে। তেলেগিণ জান্‌লা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, কোনো পরিচিত মুখ তার জন্যে অপেক্ষা করছে না। কে-ই বা আসবে? সে কাউকে খবর দেয়নি।

প্লাটফর্মে নামতেই গাড়ির গাড়োয়ানরা তাকে ছেঁকে ধরলো।

"কর্তা, আসুন, আমার গাড়িতে আসুন।"

তেলেগিণ যে গাড়িটা সামনে পেল তাতেই চেপে বসলো।

"কর্তা কি যুদ্ধ থেকে ফিরছেন?" গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলো।

"হাঁ, আমি শত্রুর হাতে বন্দী ছিলাম, পালিয়ে এসেছি।"

"অ্যারে বাবা! কর্তা ত আমাদের জব্বর লোক! আমার এক খুড়তুতো ভাই সৈন্যদল ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এই গরুর গাড়ি! বাঁ তরফ ঘুরাও! কর্তা, আপনি ত তাহ'লে অনেক দিন মস্কো-ছাড়া? এদিকে যে কত ব্যাপার হচ্ছে—"

"জোরে চালাও," তেলেগিণ তাকে বাধা দিল।

চাবুকের শব্দ, গাড়ি ছুটে চলেছে বিদ্যুৎবেগে।

"কর্তা, এই ত বাড়ি।" গাড়োয়ানের স্বর শোনা গেল।

তেলেগিণ তাকিয়ে দেখলো, একটা শাদা বাড়ির সমুখে গাড়ি এসে থেমেছে। সে নেমে পড়ে ভাড়া চুকিয়ে দিল। ওক কাঠের ভারী দরজায় সিংহের মাথা খোদাই

করা , কিন্তু ইলেকট্রিক বেল নেই। তেলেগিণের বুক কেঁপে উঠলো , সবই কল্পনা। হয়ত ওরা কেউ এখানে নেই, থাকলেও তাকে হয়ত চিনবে না।

পায়ের শব্দ, দরজা খুলে গেছে। একজন পরিচারিকা বেরিয়ে এসেছে, তেলেগিণকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো : "কাকে চাই আপনার ?"

"ডারিয়া দিমিট্রিভ্না বুলেভিন এখানে থাকেন ?"

"হাঁ, হাঁ, তিনি এখন বাড়িতেই আছেন, কর্ত্রীর সংগে গল্প করছেন। আপনি ভেতরে আসুন।"

হলে এসে ওরা পৌছালো। সেখানে তেলেগিণকে অপেক্ষা করতে বলে পরিচারিকা চলে গেল। দেয়ালে কয়েকখানা ছবি, একধারে একটা পিয়ানো, স্বরলিপির পাতা হাওয়ায় উড়ছে, দেয়ালের প্রকাণ্ড আয়নাটায় তেলেগিণের ছায়া। দরজা খোলা, একটা ওভারকোট ঝোলানো রয়েছে বারান্দায়, একটা রেড ক্রস-মার্কা টুপি। পরিচিত সুগন্ধে ঘর ভরে আছে।

তেলেগিণের মনে হল, এই তুলোর প্যাডে বিছানো আংগুরের মত অলস, বিলাসী জীবনের সংগে তার কোনো সংযোগ নেই। রক্ত এখনো তার গায়ে লেগে আছে, নাকে এখনও বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ। "কে এক ভদ্রলোক আপনার সংগে দেখা করতে চান," বাড়ির ভেতরে পরিচারিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তেলেগিণের চোখ মুদে এল, দেহ থর্থর্ করে কাঁপছে, কার কণ্ঠস্বর ? তেলেগিণ চেয়ারের হাতলটা চেপে ধরলো। "আমার সংগে দেখা করতে চান ?"

·· পদশব্দ এগিয়ে আসছে। দু-বছরের অন্তহীন প্রতীক্ষার গহ্বর থেকে উঠে আসছে পদক্ষেপ, কাছে, একেবারে কাছে। ডাশা এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, আলো পড়েছে ওর চুলে। অনেক লম্বা হয়ে গেছে, খুব রোগাও। একটা নীল গাউন ওর পরণে।

"আপনি ?"

ডাশা তাকিয়ে রইলো, তেলেগিণের মুখের দিকে—এবার পরিচয়ের আলো জ্বলে উঠেছে।

"তুমি !" ফিসফিস করে ডাশা বল্ল। শোনা যায় না ওর স্বর।

"তুমি, তুমি !"

ড্যাশা ঝাঁপিয়ে পড়লো তেলেগিণের বুকে, জড়িয়ে ধরলো তাকে। তার কম্পিত অধর থেকে চুম্বন গলে গলে পড়ছে। নরম বুকের উত্তপ্ত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে তেলেগিণের অংগে।

ডাশার চোখে জল !

"তুমি কাঁদছ ডাশা ?"

"হাঁ, কাঁদছি, চোখের জল যে বাধা মানছে না তেলেগিণ! তুমি এলে ... এতদিন পরে তুমি এলে!

"ছিঃ ডাসুশা, কাঁদে না!"

তেলেগিণ রুমাল দিয়ে ডাশার চোখ মুছিয়ে দিল। নিস্তব্ধতা, কারো মুখে কথা নেই। ওরা যেন বোবা হয়ে গেছে। ডাশা অনেকক্ষণ পরে তেলেগিণকে বল্ল, "কবে এসেছ এখানে?"

আজ, স্টেশন থেকেই তোমাদের বাড়ি এসেছি।"

"কফি আর খাবার আনতে বলি ··"

"কোনো দরকার নেই। আমি এখান থেকে সোজা হোটেলে চলে যাব।"

"সন্ধ্যেয় আসছ ত?" ডাশা ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলো। তেলেগিণ মাথা নেড়ে উঠে পড়লো। ডাশার হাত ওর হাতে এসে মিলেছে, রক্ততরংগ মুখে ছুটে আসছে, আগুন জলছে শরীরের প্রতি রোমকূপে। তেলেগিণ হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার কাছে এল, ফিরে তাকিয়ে দেখলো, ডাশা তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

"সাতটায় আসব?"

ডাশা মাথা নাড়লো। অদ্ভুত রহস্যময় দৃষ্টি ওর চোখে।

তেলেগিণ পথে এসে দাঁড়ালো। এখনো জলছে তার দেহ, চামড়ার নিচে পুড়ে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুখের ওপর লাগছে, তবুও জ্বালা নিভছে না! তেলেগিণ হাসলো। এ এক যাদু, নারীদেহের যাদু-দণ্ড তাকে স্পর্শ করেছে!

ডাশার রক্তেও জ্বালা, মাথার ভেতর এলোমেলো নানা স্বর যেন এক সংগে বেজে উঠেছে। তেলেগিণের অভাবনীয় এই আবির্ভাব তার জীবনটাকে ওলট-পালট করে দিয়ে চলে গেছে! ডাশা চোখ বুজলো, একটা অস্ফুট আর্তধ্বনি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। তারপর কাটিয়ার ঘরে ছুটে গেল।

কাটিয়া জান্‌লার ধারে বসে সেলাই করছিল। ডাশার পায়ের শব্দ শুনেই জিজ্ঞেস করলো, "কে এসেছিল?"

ডাশা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, ঠোঁট দুটি তার কাঁপছে।

"কে বোন?"

"সে ··· তুমি বুঝতে পারনি, কাটিয়া? ··· তেলেগিণ!"

কাটিয়া সেলাই রেখে ধীরে ধীরে হাত দুটো ওপরে তুললো।

"কাটিয়া—তেলেগিণ এল, তবু আমার একটুও আনন্দ হয়নি, কেমন ভয় করছে," ডাশার স্বরে নিরুদ্ধ কান্নার রেশ, "কি হবে কাটিয়া?"

পঁচিশ

সন্ধ্যা। ডাশা ড্রয়িং রুমে বসে একটা নভেলের পাতা ওলটাচ্ছিল। এক ঘণ্টায় সে এক পাতাও পড়তে পারেনি। বাইরের প্রতিটা শব্দ শুনছে কান পেতে, তেলেগিণ এখুনি এসে পড়বে।

ডাশা আবার নভেলের পাতায় মনোযোগ দিল।

"মারুসা চকোলেট খেতে ভালোবাসে। ওর স্বামী রোজ অফিস থেকে ফেরবার পথে চকোলেট নিয়ে আসে ..." বাইরে আঁধার ঘনিয়ে উঠেছে, জান্‌লা দিয়ে আসছে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া।

"মারুসা চকোলেট খেতে ভালোবাসে "—ডাশা পড়লো।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, বুকের রক্তস্রোত থেমে গেছে অকস্মাৎ।

সে নয়, বাচ্চা বেয়ারাটা সান্ধ্য খবরের কাগজ নিয়ে এল।

"সে আসবে না!" ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে টেবিল-ঢাকার ওপর; ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে মুহূর্তগুলো ঝরিয়ে যাচ্ছে, সে আসবে'না!

আবার পায়ের শব্দ। ডাশা উঠে গিয়ে দেখলো, হাসপাতাল থেকে কাগজপত্র নিয়ে একটা লোক এসেছে। ডাশা তার নিজের ঘরে গিয়ে ছোট্ট সোফাটায় গা এলিয়ে দিল। আসবে না, তেলেগিণ আসবে না! কেন আসবে? সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ তাদের দেখা, ডাশা ত বলবার কথাই খুঁজে পেলনা। ভালোবাসা নেই, সেখানে শূন্যতা, অন্ধকার, ভয় ..

ডাশা কুশনের নিচ থেকে সিল্কের রুমালখানা বার করে ছিঁড়তে লাগলো। "জানতাম, এই হবে। দু-বছরে আমি ওকে ভুলে গেছি—যাকে ভালোবেসেছি সে এ-তেলেগিণ নয়, আমার কল্পনা! আজ ও ফিরে এল, কিন্তু ওকে আমি চিনতে পারছি না, ওকে অপরিচিত বলে ঠেকছে!"

ছেঁড়া রুমালখানা ছুঁড়ে দিয়ে ডাশা সোফায় সোজা হয়ে বসলো।

"না, না, ওকে জানতে দেয়া হবে না, আমার মনের এই পরিবর্ত্তন। আমিও ভাববনা এসব, কিন্তু ভালোবাসতে পারব? না, তবে?"

"কি আর হবে? · কিছুক্ষণ পরে সে শান্ত হল। "ওরই কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেব।"

ডাশা আয়নার কাছে এল। চমৎকার! চূর্ণ অলক এসে পড়েছে বিষণ্ণ মুখের ওপর, নাক টিকলো, চোখ আয়ত, উজ্জ্বল—এত সুন্দর ও নিজে!

"কে একজন দেখা করতে এসেছেন।"—ডাশা শুনলো পরিচারিকা বলছে।

এক উষ্ণ প্রস্রবন যেন অনর্গল ধারায় ঝরে পড়ছে দেহে। সে এল, সে এল, এল...

খাবার ঘরে কাটিযা আর তেলেগিণ গল্প করছে। ডাশাকে দেখে তেলেগিণ উঠে দাঁড়ালো। নতুন ইউনিফর্ম পরণে, বেল্টটা ঝক্‌ঝক্ করছে, মুখে ক্ষতচিহ্ন, চোখে দীপ্তি। দুস্তর মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে জীবনের তীরে, নতুন জীবন সে চায়। ডাশা তেলেগিণের পাশে বসলো।

তেলেগিণ বললো তার বন্দী জীবনের ইতিহাস!—জলাভূমি, নিষ্প্রভ মিইয়ে-পড়া জীবন, রক্ষীর পদধ্বনি, মৃত্যুর ইংগিত। তারপর মুক্তি···নিশীথের অন্ধকারে লুকিয়ে পথচলা, রোরুদ্যমানা সন্তানহারা মা, অন্ধকারের বুকে মৃত্যুর তাণ্ডব। ডাশা অবাক হযে শুনলো। তেলেগিণও নিজের স্বর শুনছিল, কেমন অদ্ভুত, সুদূরাগত সে স্বর। তার পাশে স্থির দৃষ্টিতে চেযে আছে একটি মেয়ে, গাউনের প্রান্ত এসে ঠেকেছে ওরই হাঁটুতে, সুগন্ধ ছড়িযে পড়ছে নাকে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। চেনে, ঐ মেযেটিকে সে চেনে? বোধ হয না। স্বপ্নে-দেখা মুখ কি জাগরণেও হানা দেয়?

"তেলেগিণ, আমি আর তোমায় যেতে দেব না।" ডাশা এক সময়ে বল্ল।

"তা কি হয়," তেলেগিণ হাসলো।"

কাটিযা তেলেগিণ আর ডাশাকে দেখছিল। কত সুখী ওরা? ডাশা তেলেগিণের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে। একটার পর একটা কাঠি নিভে যাচ্ছে, এবার জ্বললো! তেলেগিণের জ্বলন্ত সিগারেটের আভায় লাল হয়ে উঠেছে ডাশার চিবুক। কাটিয়ার মনে পড়লো সেও সেদিন অমনি করে সিগারেট ধরিয়ে দিযেছিল, তারও চিবুক হযে উঠেছিল অমনি লাল। রোশিন এখন কোথায়?

তেলেগিণকে বিদায় দিয়ে ডাশা নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। আর তার উত্তেজনা নেই, শান্তির ছোঁযা যেন অন্ধকারে ঝরে পড়ছে। দুঃখের কুয়াশার পর নীল নিতল আকাশ দেখা দিয়েছে। সে সুখী।

ছাব্বিশ

পাঁচ দিন পরে চিঠি এল: বালটিক কোম্পানী তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

ডাশার কাছে বিদায় নিয়ে সে ট্রেনে চড়ে বসলো। ষ্টেসনের জনতা মিলিয়ে যাচ্ছে। ডাশাকে এখনো দেখা যায়, তার গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। সহরতলীর ছোট্ট বাংলোর সার দেখা দিয়েছে পথের দু-পাশে। ডাশা? ডাশার নীল গাউনের প্রান্ত আর দেখা যায় না। তেলেগিণ বেঞ্চে বসে ইউনিফর্মের আটো কলারটা খুলে ফেললো, সামনের বেঞ্চে চশমা চোখে এক বুড়ো তাকে দেখছে।

"মশাই কি মস্কো থেকে এলেন?" বুড়ো জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, মস্কো।" মস্কোর রৌদ্রাক্ত পথ, পায়ের নিচে শুকনো পাতা, আর ডাশা চলেছে, তার মার্জিত কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ছে। তার গায়ে ফুলের গন্ধ—মস্কো···!

"নবক, নবক।" বুড়ো তাব সুখ চিন্তায় বাধা দিল। "মশাই, একবার তিন দিন এসে ছিলাম। দিনেব বেলা পথে লোকের ভিড়, ধুলো, ধোঁয়া। আব রাতে?' আলো আর হল্লা। মাথা ঘুবে যায়। আপনি দেখছি যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন। আপনার মুখেব কাটা দাগটা দেখেই বুঝেছি। আচ্ছা বলুন ত, কিসেব জন্য আপনাবা যুদ্ধ কবছেন, প্রাণ দিচ্ছেন? এই আলো আব হল্লা,—এই অভিশপ্ত শহব—একে বাঁচিয়ে বাখতে? দেশ? দেশ নেই, জাব ঘুমুচ্ছেন, পাপেব ভরা পূর্ণ হয়ে উঠছে। ডুববে, ডুববে, এদেশেব মুক্তি নেই।"

"আপনাব কি মনে হয়, জার্মানবা বাশিয়া অধিকাব করবে?" তেলেগিণ জিজ্ঞাসা কবলো।

"জানি না, তবে শান্তি আমাদেব পেতেই হবে। সেদিন ঘনিযে আসছে, আব দেবি নেই!"

বুড়ো চোখ বুজে বেঞ্চেব এক কোণে গিযে বসলো।

তীক্ষ্ণ হাওযা চাবুকেব মত মুখের ওপব এসে লাগছে। বাইবে অন্ধকাব, দু-একটা আলোব বিন্দু মাঝে মাঝে দেখা যায, একবাশ কালো ধোঁযা চলে গেল মাথার ওপব দিযে। গাড়িব শব্দ, বিবামহীন একটা তীব্র হুইস্‌ল, স্টেসনেব কাঠেব প্লাটফর্ম, ঘোলাটে আলোয জনতাব ভিড, বিবতি। আবাব ছুটে চলেছে ট্রেন, বন্ধ শার্সীব ওপাশে বর্ষাব ধাবা, একটানা শব্দ।

তেলেগিণ ভাবছিল সে কত সুখী। বাতেব অন্ধকাবে সীমান্তে এখন কামানের গর্জন, হাত-বোমাব কর্কশ চিৎকাব, স্তূপীকৃত শববাশি, মুমূর্ষুব আর্তনাদে বিদীর্ণ অন্ধকাব। তবু সে সুখী ওদেব জন্য দুঃখ ত একটা সংস্কাব, মানুষেব আত্মগত বিলাস। দুঃস্বপ্নেব মত মিলিয়ে গেছে সেই অন্ধকারময বক্তাক্ত পৃথিবী, এখন সে ভালোবাসে, ভালোবাসা পেয়েছে প্রতিদানে।

কাপড ছেড়ে সে শুয়ে পডলো, চোখ বুজে এসেছে। ডাশা কাছে এসেছে যেন, ওব আযত চোখেব দৃষ্টি তাব মুখের ওপর—তেমনি প্রেম-ভবা। সে দিন ও যখন চুমু খাচ্ছিল ডাশার অনাবৃত কাঁধে, ডাশা ফিরে তাকালো, ও বল্ল, "ডাশা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?"

ডাশা কথা বল্ল না, তাকিয়ে বইলো,—নিমেষহীন প্রেম-বিগলিত দৃষ্টি!

পিটার্সবুর্গে এসে তেলেগিণ বালটিক কোম্পানীতে কাজ শুরু করলো।

তিন বছরে অনেক বদলে গেছে কারখানা। আগেব তিনগুণ শ্রমিক এখন কাজ করছে। সেই পুরনো দিনের মাতাল, বুভুক্ষু শ্রমিকের আর সন্ধান মেলে না। কোম্পানী মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে, শ্রমিকেরা এখন ভালো খায়-দায, তারা রোজ কাগজ পড়ে আর

গালাগাল দেয়। বর্তমান যুদ্ধ, জার, জারিনা, রাসপুটিন, বড় বড় সেনাপতি—গালাগাল থেকে কেউ বাদ পড়েন না। সবার মুখে এককথা : যুদ্ধ থামুক, তারপর বিপ্লব।

অবিশ্যি, তাদের চটবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। শহরের রুটির কারখানাগুলো ময়দার অভাবে রুটিতে করাতের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছে, মাংস পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও পচা, পচা আলু, চিনিতে ধুলো, আর দাম চড়ছে দিন দিন। ব্যবসায়ীরা দুহাতে পয়সা লুটছে। এক বাক্স মিষ্টির দাম পঞ্চাশ রুবল, একবোতল শাম্পেন একশ'। বিলাসী নাগরিকরা তাই কিনছে, ধুলোর মত মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে টাকা। শান্তি, শান্তি এখন কে চায়?

তেলেগিণ তিন দিন ছুটি নিয়ে একটা আস্তানার খোঁজে বেরলো। বোহেমিয়, ছন্নছাড়া জীবন তার শেষ হয়ে গেছে, পুরনো বাড়িটা খালি থাকলেও সেখানে সে ফিরে যাবে না। এখন চাই পরিচ্ছন্ন গৃহ, জানলায় সরু-লেস দেয়া নীল পর্দা, পর্দা সরালেই যেখানে দেখা যায় নীল আকাশ, নীরব বাড়ির সার। অনেক খুঁজে সে একটা বাড়ি পেল, ভাড়াটা তার পক্ষে অনেক বেশি। কিন্তু কি করা যায়? সে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ডাশাকে চিঠি লিখে জানালো।

চার দিনের দিন তেলেগিণ কারখানায় গেল। রাতে তার কাজ। কারখানার উঠোনে ঝুল-মাখা হলদে চিরপরিচিত লণ্ঠন, বাতাস হাপরের ধোঁয়ায় হলদে। লেদ চলছে, স্ট্যাম্পিং মেসিন শব্দ করছে, বাষ্পীয় হাতুড়ীর আঘাতে উঠছে প্রচণ্ড ঝংকার। আগুনের স্তম্ভ নিচু চিমনির ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার আকাশে, আশে পাশে শ্রমিকের দল কাজ করে যাচ্ছে, কারো মুখে শব্দ নেই।

কামানের গোলার খোল যেখানে তৈরি হচ্ছে, তেলেগিণ সেখানে এসে দাঁড়ালো। ইঞ্জিনিয়ার স্ট্রুকভ তাকে বুঝিয়ে দিল, কি করে খোল তৈরি হয়। তারপর তেলেগিণকে মেসিন দেখাতে দেখাতে বল্ল, "কাজ অনেক পড়ে রয়েছে, প্রায় একশ ভাগের তেইশ ভাগ। তুমি শুধু নজর রাখবে ওর চাইতে যেন বেশি না পড়ে থাকে।"

"আগে ত কখনও কাজ পড়ে থাকত না?"

"আজকাল থাকে হে, থাকে! তাতে ক্ষতিটা কি শুনি? না হয়, শতকরা তেইশটি জর্মান প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরবে!" স্ট্রুকভ হাসলো। "আর মেসিনগুলোও হয়ে এসেছে!"

একটা প্রেসের কাছে তারা এসে পড়লো। একটি বুড়ো আর একটি ছোকরা সেখানে কাজ করছিল। স্ট্রুকভ বুড়োকে বল্ল, "কি হে রুবিলিয়ভ, কাজ কি রকম এগোচ্ছে?"

"এগোচ্ছে, কিন্তু মেসিনের আর কিছু নেই! দেখুন না, একেবারে ঝর্ঝরে হয়ে গেছে!"

"এখন মেসিনটাকে পেন্সন দেয়া দরকার।" ছোকরাটি হেসে উঠলো। স্ট্রুকভ ওদের দিকে তাকিয়ে তেলেগিণকে বল্ল, "ওরা বাপ-বেটায় কারখানায় সব চাইতে ভালো কাজ করে।"

পরস্পরকে শুভ রাত্রি জানিয়ে এবার তারা বিদায় নিল। যে যার কাজে যাবে।

তেলেগিণ কদিনেই কবিলিয়ভদের সংগে ভাব করে ফেললো। রোজ রাতেই সে কবিলিয়ভদের প্রেসের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, শোনে বাপ-বেটা তর্ক করছে।

বুড়োর ছেলে ভাস্কা বেশ পড়া-শুনো করেছে, তার মুখে এক কথা : শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিকের অধিকার, সার্বভৌমত্ব। সে যেন বিষ ছিটায় তার স্বরে। বুড়ো কবিলিয়ভ ধার্মিক লোক, সে বলে, "ও সব শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিকের সর্বময় অধিকার আমি বুঝি না। আমাদের পুরনো পুঁথিতে লেখা আছে, এই যুদ্ধে রাশিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর নির্জন মঠ থেকে আসবেন এক সন্ন্যাসী, তিনি শাসন করবেন আমাদের।"

"সেই পুরনো, লোক-ভুলানো তন্ত্র।" ভাস্কা ছুঁড়ে মারে।

"পাজি, হতভাগা, ঐ এক বুলি শিখেছেন। সমাজতন্ত্রবাদ না মুণ্ডু।"

"সমাজতন্ত্রবাদের তুমি কি বুঝবে? তুমি ত চির-বিদ্রোহী।"

"না," কবিলিয়ভ বাড়া রাতুটাকে হাপরের ভেতর থেকে টেনে বার করে। "চির-বিদ্রোহী আমি নই। তবে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা করে তোমাদের মত চেঁচাতেও আমি চাই না।"

"কিন্তু তুমি না বলেছিলে মনে প্রাণে তুমি বিপ্লবী?"

"সে ত আমি এখনও বলি। যদি কিছু একটা ঘটে আমি কি চুপ করে হাপরের কাছে বসে থাকব? জারকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমি মুঝিক, তিরিশ বছর ক্ষেতে লাঙল ঠেলেছি, কি পেয়েছি তার মজুরী? আমারই শ্রমের ফসলে ফেঁপে উঠেছে যত সব কুঁড়ের দল, আর আমার ভাগ্যে দুবেলা খাওয়াও জোটেনি। তোমার ঐ পুঁথি-পড়া স্বাধীনতা, আর সমাজতন্ত্রবাদ দিয়ে আমি কি করবো, ওতে আমার পেট ভরবে না। আমি চাই জমি আমাদের হোক, আমরা নিজেদের জন্য লাঙল চালাই, শস্য বুনি—সেই ত সত্যিকারের স্বাধীনতা। আমি বিপ্লবী, আমি চাই মুঝিকেরা মুক্তি পাক। আমি আর কিছু চাই না।" আর তর্ক চলে না। বুড়ো আর তার ছেলে দ্রুত কাজ সারে। তেলেগিণ উঠে দাঁড়ায়। রাত শেষ হয়ে এসেছে।

পিটার্সবুর্গে এসে তেলেগিণ ডাশাকে রোজ চিঠি লেখে; ডাশা উত্তর দেয় মাঝে মাঝে। ডাশার চিঠিগুলো অদ্ভুত—ঠাণ্ডা বরফ মোড়া যেন! পড়তে পড়তে হাড়ে

কাঁপুনি ধরে। সেদিন তেলেগিণ জান্‌লার ধারে বসে চিঠি পড়ছিল। বড বড হরফ, লাইনগুলো একটু বাঁকা, নীল কাগজ থেকে একটা মৃদু সুগন্ধ উঠছে। তেলেগিণ বাইরে তাকালো। মেঘলা আকাশ, পংকিল খালের জলেব মতই কালো। বৃষ্টি এখনই সহস্র ধারায ঝরে পড়বে। ডাশাব চিঠিটাব দিকে আবার দৃষ্টি ফিবে এসেছে। ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা চিঠি।

সে লিখছে: "বন্ধু, চিঠিতে জানলাম, তুমি একটা বড ফ্লাট ভাডা নিযেছ, মিথ্যে কেন এত খরচের ভেতব গেলে? পাঁচটা ঘর পবিষ্কাব রাখতে অন্ততঃ দুটো ঝির দরকার, কিন্তু আজকাল ঝি পুষতে যে কত টাকা লাগে নিশ্চয়ই তুমি ভালো করে জান। মস্কো-এ এখন হেমন্ত, বিবর্ণ, কুশ্রী দিন, বোদ উঠবে সেই বসন্তে·
তাদের বিবাহ বা ভবিষ্যৎ সংসাবেব কোনো উল্লেখ নেই। এখন বিবর্ণ হেমন্ত আর দুঃসহ শীত আসুক দীর্ঘ বিবহ নিযে, তারপব বসন্তেব বৌদ্রকবোজ্জ্বল দিনে যখন বরফ গলে যাবে, তখন আসবে মিলন। ততদিন তেলেগিণকে অপেক্ষা কবতে হবে।

ডাশা লিখছে:

"... বেসনভের মৃত্যুর কথা তোমাকে জানাবো না ভেবোছলাম। কিন্তু কাল ওর শোচনীয় মৃত্যুব বিস্তারিত বিবরণ শুনে মন এতই খারাপ লাগছিল যে, তোমাব চিঠিতে ওব কথা না লিখে পাবলাম না। সীমান্তে যাবাব আগে একদিন বুলেভারে আমাব সংগে বেসনভেব দেখা হযেছিল। সেদিন আমি তাকে প্রত্যাখ্যান না কবলে তাব আজ এই অপমৃত্যু হত না। কিন্তু তাছাডা যে আমার উপায় ছিল না। কিন্তু ওকে কি আমি ভুলতে পাবব? জীবনের চলার পথে পডে বইলো ওর মৃতদেহ।"

তেলেগিণ চিঠির উত্তরে লিখলো:

"তুমি কেন বেসনভেব মৃত্যুব কথা আমাব কাছে লুকোতে চেযেছিলে জানি না। আমার মাঝে মাঝে মনে হয কি জান? তুমি যদি আজ অন্য কাউকে ভালোবাস—আমার পক্ষে মৃত্যুব সমান হলেও আমি তাকে স্বীকার করে নেব। আব শান্তি ফিরে আসবে না, আমার জীবনেব সূর্য কালো মেঘে ঢাকা পডবে। কিন্তু ভালোবাসা ত শুধু সুখ নয, দুঃখও। বেসনভও ঐ কথা নিশ্চয়ই ভেবেছিল। তুমি মুক্ত, আমি তোমাব কাছে জোর করে কিছু আদায় কবতে চাই না। হায়, কি দুর্দিনেই আমরা পরস্পরকে ভালোবেসেছিলাম! ..."

দুদিন পরে কারখানা থেকে ফিরে তেলেগিণ একটা টেলিগ্রাম পেল:

"খুব ভালোবাসি—তোমারই ডাশা।"

সাতাশ

তেলেগিণ কারখানা থেকে বেরলো। রাত শেষ হয়ে এসেছে, কনকনে ঠাণ্ডা, একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। এমনি সময় শহবেব ভেতরেও গাড়ি পাওয়া যায় না। তেলেগিণ কোটের কলাবটা তুলে নিয়ে চলতে শুরু করলো। সূক্ষ্ম তীরের মত বরফ এসে বিঁধছে চোখে মুখে, জুতোব ঘায়ে বরফ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। দু-একটা বাড়িব আলো বন্ধ শার্সীব ভেতর দিয়ে এসে পড়েছে পথে, ঘোলাটে ছায়া তাদের। একটা খাদ্য ভাণ্ডারেব সমুখে একটা কিউ, একটা পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে। তেলেগিণ তাকিয়ে দেখলো, কিউব ভেতব স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েবা কম্বলে বা ছেঁড়া আলোয়ানে গা মুড়ে ডিসেম্বরেব এই শীতে ভাণ্ডারেব দোর খোলাব অপেক্ষা করছে।

"কাল ভিবর্গ স্ট্রীটে তিনটে দোকান লুট হয়েছে,' কে যেন বল্ল।

"বেশ হয়েছে।"

"লুট না করে উপায় কি বলো? এমনি ত পয়সা দিলেও জিনিস পাওয়া যায় না। কাল দোকানে এক পাইণ্ট কেরোসিন চাইলাম, বল্লে ফুরিয়ে গেছে—অথচ একটু পরে ডেমেনটিয়েভদের চাকর এসে আমার চোখের সামনে পাঁচ পাইণ্ট কিনে নিয়ে গেল।"

"কত দাম কেরোসিনের?'

"দামের কথা আর বলো না,—আড়াই রুবল।'

"এত দাম! দোকানীরা তাহলে দু-হাতে লুটছে বল?'

"তা বই কি। তবে তার ফলও পাবেন বাছাধনরা।"

"আমাব বোন বলছিল, ওকৃটায় একটা দোকানী এমনি লাভ করছিল, সবাই মিলে তাকে একটা কেরোসিনের পিপেয় চুবিয়ে মেরেছে।"

"কিন্তু একটাকে মেরে কি হবে, হাজার হাজার দোকানী রয়েছে সারা রাশিয়ায়। সরকার থেকে আইন না করলে আমরা মারা পড়বো।"

"আইন!" কে একজন হেসে উঠলো।

"উঃ ওদের কি মজা! আমরা এই শীতে জমে যাচ্ছি, আর ওরা দিব্যি ঘুমোচ্ছে

"কাদের কথা বলছো?"

"কাদের আবার? যাদের জন্য এই আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সেই মনিবদের কথাই বলছি। আমার মনিব এক জেনারেলের বৌ, বেলা এগারোটার আগে তার ঘুম ভাঙে না। তারপর রাত এগারোটা পর্যন্ত খাওয়া আর খাওয়া! চেহারাখানাও হয়েছে দেখবার মত—একটা হাতি আর কি!"

"আমার মনিবটি তার চেয়েও সরেস। হুকুমে হুকুমে অস্থির করে তোলে। এই ত সে দিন বাজার থেকে ফিরে দেখি, টেবিলে খুব আড্ডা জমিয়ে বসেছে, ভড়কার শ্রাদ্ধ হচ্ছে।"

"শুনেছি ওরা শত্রুর কাছ থেকে টাকা খাচ্ছে।"

ভাঙা গলায় কে একজন পুলিশটাকে জিজ্ঞেস করলো। "শুনছেন।"

"কি ব্যাপার?"

"আজ নুন দেবে?"

"বোধ হয় না।"

"তাহলে আর মিছে দেরি করছি কেন?"

"কি, নুন দেবে না আজ? পাঁচ দিন আমরা আলুনি খেয়ে রয়েছি।"

"সয়তান।"

"চিৎকার করে কি হবে?" পুলিশটা বল্ল।

তেলেগিণ চলতে লাগলো। নির্জন পথ, বিউর কথাবার্তা আর শোনা যায় না। স্বল্পান্ধকারে ব্রীজটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপারে নেভার পথে আলোর মালা এখনো নেভেনি। বরফ গলছে, বাতাস ট্রামের তার দুলিয়ে দিয়ে হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে। তেলেগিণ ব্রীজের ওপর এসে থামলো, তারপর আবার চলতে শুরু করলো।

পরিবেশে জমে উঠেছে কালো মেঘ। সুখের কল্পনা এখন ভুল। মস্কো থেকে বিদায় নেবার সময় সে ভেবেছিল, জীবন আবার নতুন পাতা মেলছে, প্রাণের প্রাচুর্য দিকে দিকে। কিন্তু কোথায় সে জীবন? ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের রাতে প্রকাণ্ড কিউ দাঁড়িয়ে আছে।—ক্ষুধা, অভাব, হাহাকার, অস্থিচর্মসার বুকের নিচে বিক্ষোভের রোষবহ্নি। জীবন-পাতা মেলছে না, পাতা কুঁকড়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে, ঝরে পড়ার আভাস সেখানে।

ডাশার নীল গাউনের প্রান্ত দুলছিল সেদিন হাওয়ায়, মস্কো সরে যাচ্ছিল সেদিন এসেছিল জীবনের পরিপূর্ণ ইংগিত, আর আজ? যুদ্ধের মুষ্ট্যাঘাতে জীবন-মন্দিরের স্তম্ভ কেঁপে উঠছে, চূড়ায় ধরেছে ভাঙন, পাথর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে তেলেগিণ আর ডাশা। প্রেমোন্মাদনা তাদের হৃদয়ে, সুখের স্বপ্ন দেখছে তারা—কিন্তু তা কি উচিত?

দূরে নেভার আলো মিটমিট করে জ্বলছে। তেলেগিণ অনেকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে ভাবলো, "কেন লুকোবার চেষ্টা করছি? চাই পরিপূর্ণ জীবন, চাই শান্তি! এই যে চারদিকে হাহাকার, প্রকাণ্ড কিউ—কিন্তু আমি কি করব? আমি ত

আব যুদ্ধেব জন্য দায়ী নই। তবে কেনই বা আমাব আনন্দ আমি বিসর্জন দেব? কিন্তু সুখী হতে পারব কি?"

তেলেগিণ ব্রীজ পাব হল। ইলেকট্রিক আলোব মালা দুলছে প্রবল হাওয়ায়, গুঁড়ো গুঁড়ো ববফ পড়ছে। উইনটার প্রাসাদের জানলায আলোব একটি বেখাও দেখা যায না। একটা প্রহরী বাইফেল বুকে চেপে ঠায় দাঁড়িযে আছে। তেলেগিণ একবাব তাকিযে দেখলো।

ববফ পড়ছে, হাওযাব ঝাপটা মুখেব উপব, নির্জন পথ, উইনটাব প্রাসাদেব রুদ্ধ বাতাযন, সশস্ত্র প্রহবী। চলতে চলতে তাব মনে হল, একটা সত্য সে আবিষ্কাব কবেছে। আজ সে সবাইকে চেঁচিযে বলতে পাবে:

"এমনি কবে বেচে থাকা চলে না। বিদ্বেষেব ওপব শাসনতন্ত্রেব ভিত্তি, সীমান্তে সীমান্তে ছড়িযে পড়েছে বিদ্বেষ, তোমবা সবাই এক একটা বিদ্বেষেব জীবন্ত পিণ্ড—এক একটা দুর্গ, যাব প্রতি বন্ধ্রে মাবণাস্ত্র হা-কবে বযেছে। না, না, জীবন এ নয, এ এক অসহ্য যন্ত্রণা। পৃথিবীব দম বন্ধ হযে আসছে—বক্ত নদী বয়ে যাচ্ছে শতধাবায। তবু কি যথেষ্ট হয়নি? এখনও কি তোমাদেব চোখ খোলেনি। তোমাদেব চোখ খুলবে তখন, যখন প্রতি গৃহে ছড়িযে পড়বে বিদ্বেষেব কণা, হত্যায হত্যায পংকিল হযে উঠবে গৃহেব শান্তি। তখন আব প্রতিকাবেব সময থাকবে না। ওঠ, ওঠ, চোখ খোল, অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দাও, সীমান্তেব সৈন্য-ছাউনি ভাঙ, অববোধ মুক্ত কব। আসুক ভালোবাসা—জীবন আবাব পূর্ণ হযে উঠুক। তোমবা জান না, শুধু ভালোবাসার নামেই মানুষ বেঁচে ওঠে। পৃথিবীতে বয়েছে অফুবন্ত শস্যেব ক্ষেত, গরু-চবাণো মাঠ, আংগুরের বাগান—সকলের তাতে সমান অধিকাব। তবু হানাহানি চলেছে, কামান গর্জাচ্ছে, বক্তে ভিজে উঠছে পৃথিবীব বুক, কিন্তু কেন? কেন, শুনবে কেন? মানুষেব বুকে যে ভালোবাসা নেই।"

তেলেগিণ একটা গাড়ি দেখতে পেযে চড়ে বসলো। গাড়িব ভেতব বসে কম্বল টেনে দিল গাযে, চোখ বুজে এসেছে, শবীবে ক্লান্তি। "ডাশা, ডাশাকে আমি ভালোবাসি," তেলেগিণ ভাবলো,—এই ত আমার পবম আনন্দ, আসুক যুদ্ধ, বিষাক্ত হোক হাওযা বারুদেব গন্ধে · কিন্তু আমি ভালোবাসি

আটাশ

তেলেগিণ ভেবেছিলো, বড়দিনের ছুটিতে সে মস্কো যাবে, কিন্তু হল না। বালটিক কোম্পানী থেকে তাকে পাঠানো হল সুইডেনে, সেখান থেকে ফিরবে ফিরতে ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হ'য়ে গেল। এসেই সে ডাশাকে টেলিগ্রাম করলে সে আসছে।

কারখানায় এদিকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সংগে ভালো ব্যবহার করছেন। কিন্তু শ্রমিকরা খুশী হয়নি। তাদের মুখ দেখে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে তারা ধর্মঘট করতে পারে।

এদিকে ডুমায় খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলছে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তার বিবরণ পড়ে শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। জারের মন্ত্রীসভা আর রূপকথার বীরদের উঁচু আসনে নেই, তারা সর্বসাধারণের মত প্রলাপ বকছেন, খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে মিথ্যার জাল বুনছেন। কিন্তু জাল বুনলে কি হবে মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে। প্রতি লোকটা জানে, তারা দেশের এই দুর্দশার জন্য দায়ী সীমান্তে সৈন্যদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। শীঘ্রই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করবে।

মস্কো রওনা হওয়ার আগের দিন রাতে তেলেগিণ কারখানায় কাজ করতে করতে লক্ষ্য করছিল শ্রমিকদের উত্তেজনা। তারা মেসিনের পাশে বসে চাপা গলায় কি যেন আলোচনা করছে। তেলেগিণ ভাসকাকে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে?"

ভাস্কা কোনো কথা না বলে চলে গেল।

"ভাস্কা একটা পিস্তল জোগাড় করেছে।" আইভান কবিলিয়ভ বল্ল।

ভাস্কা ঘরে ঢুকলো একখানা কাগজ নিয়ে। শ্রমিকরা তার কাছে ভিড় করে দাঁড়ালো।

"শোন," ভাসকা চিৎকার করে বল্ল, "লেফটেনান্ট—জেনারেল খাবালভ কি ঘোষণা করেছেন: এই কদিন আগের মতই রুটি তৈরি হচ্ছে প্রতি রুটির কারখানায়, রুটির অভাব সম্বন্ধে যে গুজব রটেছে তা সম্পূর্ণ অমূলক ..."

"মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।" চারদিক থেকে শ্রমিকরা চিৎকার করে উঠলো।

"শোন আরও লিখেছে," ভাস্কার স্বর শোনা গেল, 'রুটির অভাব কখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

"আর আমরা আজ তিনদিন ধরে রুটি পাচ্ছি না!"'

"অভাব হলে বুঝতে হবে," ভাসকা পড়লো, "অনেক দোকানদার রুটির ময়দা দিয়ে বিস্কুট তৈরী করছে।"

"বিস্কুট তৈরি করছে! খাবালভরা সেই বিস্কুট চিবুচ্ছেন, আর আমরা শুকিয়ে মরছি!"

"ভাই সব," ভাস্কা কাগজটা পকেটে রাখলো, "আমরা খাবালভের কাছে দাবী জানাব, বিস্কুট সে আমাদের দেখাক। চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি। অবুকভের কারখানা থেকে চার হাজার মজুর নেভস্কির দিকে চলেছে। ভিবর্গের মজুরনীরা তাদের সংগে যোগ দিয়েছে। খাবালভরা অনেক ইস্তাহার খাইয়ে আমাদের পেট ভরিয়েছে, আর নয়!"

"হাঁ, হাঁ, চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

"খাবালভকে আমাদের দাবী জানাব।"

"আমরা ইস্তাহার অনেক পড়েছি, এবার আমরা রুটি চাই।"

"রুটি, রুটি!"

"রুটি তারা কোত্থেকে দেবে? শহরে তিনদিন খাওয়ার মত ময়দা আছে। য়ুরাল থেকে আর ট্রেন আসছে না, অথচ ওখানকার গোলাবাড়িগুলো খাদ্যে ভর্তি, চেলিয়াবিন্স্ক স্টেশনে তিন হাজার টন মাংস পচছে, সাইবেরিয়ায় মাখন দিয়ে মেসিনের চাকা পরিষ্কার করছে ..."

একটি অল্প বয়সী ছেলে রুবিলিয়ভকে বাধা দিল:

"কেন এসব বলছ তুমি?"

"কেন বলছি?" ভাস্কা রুবিলিয়ভ হাসলো, "কাজ বন্ধ কর, চুল্লির আগুন নিভিয়ে দাও, ওদের চাকার নিচে আমরা আর পিষে যেতে চাই না।"

শ্রমিকদের মধ্যে ভাসকার কথার প্রতিধ্বনি উঠলো: হাঁ, কাজ বন্ধ কর, আমরা পিষে যেতে চাই না!

তেলেগিণ দাঁড়িয়ে শুনছিল, ভাস্কা তার কাছে এসে বল্ল, "সময় থাকতে চলে যান।"

তেলেগিণ মাথা নাড়লো।

পরদিন ভোরে একটু দেরিতে তেলেগিণের ঘুম ভাঙলো। সারারাত তার ভালো ঘুম হয়নি, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার আজ অনেক কাজ, মস্কো যাবার আগে অনেক কাজ সারতে হবে। তেলেগিণ জান্‌লা দিয়ে তাকালো! বাইরে বৃষ্টি, টিপ্‌ টিপ্‌ করে একটানা বৃষ্টি পড়ছে। মগজে যেন একটা অস্বস্তি ঘনিয়ে এসেছে। 'ছাব্বিশে পর্যন্ত বসে থেকে কি হবে, আমি কালই চলে যাব,' সে ভাবলো।

স্নান সেরে কফি খেয়ে বেরতে-বেরতে অনেক বেলা হল। পথে ট্রামে যাত্রীদের ভিড়। তেলেগিণ একটা ট্রামে উঠে পড়লো। যাত্রীদের মুখে একটা

চাপা উত্তেজনা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ট্রামের কাচের শার্সির ওপর, ভেতরে ছাট আসছে, ঘন্টির শব্দ কেমন বেসুরো। তার মুখোমুখি বসেছে একজন সামরিক কর্মচারী, গালফুলো, চোখে মুখে অস্থির। তেলেগিণ তাকিয়ে দেখলো, সবার মুখেই অস্থৈর্যের ছোপ লেগেছে।

ট্রাম এসপ্লানেডে এসে গেল। ড্রাইভার চেঁচিয়ে বল্ল, "ট্রাম আর যাবে না।"

যতদূর চোখ যায় সারি সারি ট্রাম দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথে জনতা, কয়েকটা বাচ্চা ছেলে এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে। আশে-পাশের দোকানের লোহার দরজা বন্ধের শব্দ হচ্ছে। বরফ পড়ছে।

একটা লোক ট্রামের ছাদের ওপর উঠে কি যেন বলছে চিৎকার করে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে জনতা। লোকটা একটা দড়ি বাঁধলো ট্রামের ছাদে, তারপর নেমে এল। তেলেগিণ দেখতে পেল, অনেকগুলো লোক মিলে ট্রামেবাঁধা দড়িটা টানছে। ট্রামটা কাৎ হয়ে পড়ছে। এইবার উল্টে গেল। ঝন ঝন শব্দ, বিক্ষুব্ধ জনতার উল্লাস।

"আশ্চর্য, একটা পুলিশের দেখা নেই।" কে যেন বল্ল।

"পুলিশ এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে।"

কারা যেন ধীরে ধীরে শোকগাথা গাইছে।

নেভস্কির দিকে চলতে চলতে তেলেগিণ লক্ষ্য করলো, পথে তেমনি উত্তেজিত জনতা, বড় বড় বাড়ির দেউড়িতে দরোয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে, জানলায় মেয়েরা।

.একজন ভদ্রলোক একটা লোককে জিজ্ঞেস করলো: "ওহে, বলতে পার, এত ভিড় জমেছে কেন?"

"রুটি না পেলে ওরা দাংগা করবে।"

"ওঃ।"

একটি মহিলা চৌ-মাথায় দাঁড়িয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলেন: "ওরা অত ভিড় করেছে কেন? কি চায় ওরা?'

"রুটি চায় ওরা। না পেলে বিপ্লব শুরু হবে।"

—ভদ্রলোকটি হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

একটি মজুর পথ চলতে চলতে চেঁচিয়ে উঠলো, "ভাই সব, আর কতদিন ওরা আমাদের রক্ত চুষে খাবে?"

একটা গাড়ি এসে থামলো। একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জান্‌লা দিয়ে মুখ বার করে বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

"দেখ, দেখ!" জনতা তাকে দেখে চিৎকার করে উঠলো, "আমাদের রক্ত খেয়ে ওর পেট কত মোটা হয়েছে!"

এবার ব্রিজের দিকে চলেছে জনতা। পাতলা কুয়াশা চারদিকে। বরফ পড়ছে, জনতা গাইছে গান। পথের ধারে একজন অশ্বারোহী সামরিক কর্মচারী টুপি তুলে তাদের অভিবাদন জানালো। …

তেলেগিণ চলেছে, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস, গলায় স্ফীতি, সে লিটেইনির পথ ধরলো।

লিটেইনির পথে পথে তেমনি উত্তেজিত জনতা, জান্‌লায়-জান্‌লায় ভয়ার্ত মুখ। রাইফেল হাতে নিস্পন্দ সৈন্যদল পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জনতার গতি থেমে গেছে। অনেক কণ্ঠে চিৎকার উঠলো, "থামো !"

এক মুহূর্তের বিরতি। হাজার মেয়েলি কণ্ঠে বেজে উঠলো, "রুটি, রুটি ! আমরা রুটি চাই !"

তেলেগিণের দিকে তাকিয়ে সৈন্যদলের অধিনায়ক বল্লেন, "এই মিছিল আমরা যেতে দিতে পারি না।" জনতার ভেতর থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠলো, "ওদের হুকুম আমরা মানব না !"

জনতা আবার চলতে শুরু করেছে, পথের দুধারের বাড়িগুলোর দরজা সশব্দে বন্ধ হচ্ছে, আবার চিৎকার : "রুটি, রুটি ! আমরা রুটি চাই !"

তেলেগিণ শুনতে পেল, সৈন্যদলের অধিনায়ক চিৎকার করে বলছেন : "গুলি চালাবার হুকুম হয়েছে, কিন্তু বৃথা রক্তপাত করতে আমি চাই না ·· তোমরা চলে যাও ·· "

"রুটি, রুটি ! আমরা রুটি চাই।" আবো জোরে চিৎকার উঠলো। সেনাদলের দিকে জনতা এগোচ্ছে। উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ওদের চোখ। ওরা ঠেলছে। তেলেগিণ একটা ধাক্কা খেয়ে একপাশে সরে গেল। "আমরা রুটি চাই ! নিপাত যাক সয়তানের দল !" কে একজন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, চিৎকার শোনা যাচ্ছে : "তোদের আমরা ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।"

হঠাৎ জনতার চিৎকার ছাপিয়ে শব্দ হল, কারা যেন ফালি ফালি করে ফেলছে কাপড়। একটি স্কুলের ছেলে দৌড়ে জনতার ভেতর ঢুকলো … সেনাদলের অধিনায়ক চোখবুজে ক্রস চিহ্ন আঁকলেন।

একবার গুলিবর্ষণের পরেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। বরফের উপর পড়ে রইল টুপি, আর গলোশগুলো। নেভস্কির পথে তেলেগিণ শুনতে পেল জনতা তেমনি চিৎকার করছে। প্রশস্ত পথ লোকে লোকারণ্য। ফুটপাথে সৈন্য, সম্ভ্রান্ত বিলাসিনী আর ছাত্রদলে ছেয়ে গেছে। দোকানের কাচের ওপর নাক রেখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ের দল। পথের মাঝখানে শ্রমিকদের মিছিল, কুয়াশায় কেমন আবছা দেখাচ্ছে। একদল অশরীরী বুভুক্ষু আত্মা যেন কবর থেকে যুগযুগান্তের ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। চাই তাদের অন্ন, চাই প্রাণ, চাই মুক্ত বায়ু, চাই রুটি। রুটি। রুটি।

একটা গাড়ির গাড়োয়ান কোচবাক্স থেকে মুখ বাড়িয়ে গাড়ীর আরোহিণীকে বলছে: "দেখছেন ত কি অবস্থা! এর ভেতর গাড়ি চালানো অসম্ভব।"

"এই উল্লুক! ভালো চাস্ ত গাড়ি চালা।" মহিলার কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত।

"বটে! চালাব না গাড়ি! আপনি নেমে যান আমার গাড়ি থেকে।"

পথ চলতে চলতে পথিকরা প্রশ্ন করছে: "লিটেইনির খবর কি সত্যি? গুলিতে নাকি একশ' লোক মারা গেছে?"

"না হে না, ওরা একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক আর এক বৃদ্ধকে মাত্র মেরেছে।'

"বৃদ্ধকে মারলো কেন?"

"প্রটোপোপভের কাজ। সে-ই ত হুকুম দিল। লোকটা বদ্ধ পাগল।"

"ওহে আরও খবর আছে। শুনে এলাম, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"কি? কি খবর?"

"কারখানাগুলোর দরজা বন্ধ, শ্রমিকরা সব ধর্মঘট করেছে

"সে কি! জল, ইলেকট্রিক—এসব কারখানা?"

"হাঁ, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন এবার।"

"তাহলে শ্রমিকরা একটা কাজের মত কাজ করলো, বল

"অত খুশী হযো না ভাই। ওরা যে-কোন মুহূর্তে শ্রমিকদের সায়েস্তা করবার শক্তি রাখে।"

তেলেগিণের কোনো কাজই করা হল না, সে বাড়ি-মুখো চললো।

পথে গাড়ি চলছে, বরফ পরিষ্কার করা হচ্ছে। প্রতি চৌ মাথায় কালো কোট গায়ে পুলিশ। উত্তেজিত জনতা আর তাদের ঘোলাটে চিন্তাধারা থিতিয়ে গেছে। যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় যেন আবার শৃংখলা ফিরে এসেছে। সেই যাদুদণ্ড পুলিশের হাতের ব্যাটন।

একটা লোক রাস্তা পার হতে হতে বিড বিড় করে চৌ-মাথায় পুলিশটার দিকে চেয়ে বল্ল: "তোমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।" কিন্তু এ-কথা কেউ বুঝতে পারলো না যে, ঐ গোঁফওলা অতিকায় শান্তিরক্ষকের দিন ফুরিয়ে গেছে। তার হাতের ব্যাটনে রাজশক্তির যাদু আর নেই, সে এখন শান্তিরক্ষক নয়, তার ছায়া। কাল থেকে তাকে আর চৌ-মাথায় দেখা যাবে না। সে মুছে যাবে লোকের জীবন থেকে, স্মৃতি থেকে।

"তেলেগিণ! ও তেলেগিণ! তুমি কি কালা নাকি হে?"

স্ট্রুকভ ওর কাছে এসে দাঁড়ালো।

"আরে চল, চল, এমন দিনে কাফেতে বসে একটু আমোদ করা যাক।"

তেলেগিণকে টানতে টানতে সে একটা কাফেতে গিয়ে হাজির হল। প্রতি টেবিলে তর্ক চলছে, চুরুটের ধোঁয়া উঠছে। ওরা একটা জানলার ধারের টেবিলে বসলো।

"রুবলের দাম পড়ে যাচ্ছে।" স্টকুভ চেঁচিয়ে বললো, "শেয়ারের বাজার ত একেবারে ডুবতে বসেছে। ঐখানেই ত সরকারের সব আশা ভরসা। তারপর তুমি কি দেখলে ?"

"লিটেইনিতে গুলি চলেছে, কিন্তু বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি।"

"আচ্ছা, এই বিক্ষোভ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি ?"

"কি আবার মতামত ? সরকারকে খাদ্য-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"সরকার খাদ্যসমস্যা সমাধান করবে! ফঃ! ওরা কি বলে চিৎকার করছে জান ? ওরা সরকারকে চায় না, ওরা চায় সোভিয়েট।"

"সত্যি ?"

"হাঁ, একেবারে খাঁটি সত্যি। এইবার জার বিদায় হলেন বলে, আজকের এই বিক্ষোভ, দাংগা নয়, বিপ্লব নয়, এ-হচ্ছে বিশৃংখলার শুরু। দেখবে, তিনদিনের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট, সেনাবাহিনী, পুলিশ, গভর্ণর—কেউ থাকবে না, থাকবে শুধু শ্রমিকের দল। গণ্ডার বা বাঘকে তবু দাবিয়ে রাখা যায়, পোষ মানানো যায়, কিন্তু শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখা চলবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, রাশিয়ার ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে যাবে।"

"তুমি ভুল করছ," তেলেগিণ উত্তর দিল, "রাশিয়ায় বিশৃংখলা আসতে আমরা দেব না। আমরা বিপ্লব চাই, সে আসুক, কিন্তু বিশৃংখলার স্থান এখানে হবে না।"

"আজ যা দেখছ—এ বিশৃংখলা,—বিপ্লব এখনো বহু দূরে। যখন এক সত্যে, এক আদর্শে আজকের এই জনতা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখনই আসবে বিপ্লব, তখন এই গোলমাল, এই হৈ চৈ থাকবে না, নির্দিষ্ট কম পদ্ধতি পাব আমরা।"

"বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক।" তেলেগিণ বল্ল। তেলেগিণ বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুম আসছে না, স্টক্হল্‌মে কেনা বাক্সটা থেকে চামড়ার গন্ধ বেরুচ্ছে, ঘর ভরে গেছে গন্ধে। ডাশাকে উপহার দেবে সে ঐ বাক্সটা। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, গাড়ি ছুটেছে। বাইরে পাইনের বন, সূর্য উঠছে, তুষারাবৃত পাহাড়। ডাশা বসে আছে, ভ্রমণের পরিচ্ছদ তার পরনে, বাক্সটা রয়েছে তার হাঁটুর ওপর, চামড়া আর ডাশার গায়ের সুগন্ধে কামরা ভরে গেছে ...

"আজ একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল," তেলেগিণ ভাবলো। কুয়াশাচ্ছন্ন পথে ঘোলাটে, ধূসর বিবর্ণ আলোর রেখা। যারা আজ ভুখ মিছিলে বেরিয়েছিল,

তারাও দেখছে ঐ আলো। এই নগর,—হাপরের আগুনে যেখানে নবীন প্রাণ আহুতি দেয়, চিমনির পথে ধোঁয়া হয়ে বেরোয় যেখানে বুকের রক্ত, বিষাক্ত যার আকাশ-বাতাস—সে নগর যাক—দাংগায়, মৃত্যুতে সে নগর ধ্বংস হয়ে যাক। এই সর্বনাশা যুদ্ধের হাত থেকে ত তবু তারা বাঁচবে। তেলেগিণ পরদিন বারটার সময় বাড়ি থেকে বেরল। পথ জনবিরল, বরফ পড়ছে। একটা ফুলের দোকানে শো-কেসে একটা রক্ত গোলাপের তোড়া—মুক্তার মত জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে পাপড়ি দিয়ে। তেলেগিণ তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

পাঁচজন অশ্বারোহী কসাক সৈন্য যাচ্ছে। ছেড়া-টুপি পরা একটা লোক এগিয়ে এসে একজনের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে। তেলেগিণের বুক কেঁপে উঠলো ভয়ে। যাক্! ওরা হাসছে, কোনো ভয় নেই।

নদীর ধারে ভিড়। পিঁপড়ের মত সার বেঁধে লোকগুলো বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, গতকালের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করছে, প্রতিমুহূর্তে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন গুজব। ব্রিজের ওপর একদল সৈন্য পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো চিৎকার করছে :

"তোমরা ব্রিজ জুড়ে রয়েছ কেন? আমাদের যেতে দাও।"

"আমরা শহরে যাব।'

"আমরা ট্যাক্স দিই না।"

"ব্রিজ পথিকদের জন্য, তোমাদের মত শান্তিভংগকারীদের জন্য নয়।' –গম্ভীর স্বর শোনা যায়।

আবার চিৎকার। "তোমরা কি রুশ?"

"রুশ নয়, জারের কুকুর।"

"আমাদের যেতে দাও!"

একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারী ব্রিজের ওপর পায়চারি করছে। তার শিরস্ত্রাণের চূড়া, কোষবদ্ধ তলোয়ার দেখা যাচ্ছে। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গাল দিল।

"এই ত তোমাদের স্বভাব," সামরিক কর্মচারী বল্লেন, "আমি তোমাদের শহরে ঢুকতে দেব না। দরকার হয়ত গুলি চালাতে হবে, তোমরা যাও এখান থেকে!"

"আমরা যাব না, তোমার সৈন্যরা আমাদের ওপর গুলি চালাবে না।"

"ওরা পথ বন্ধ করে রেখেছে," কে যেন বলছে,"প্রতিটা ব্রীজের ওপর ওদের সৈন্যরা রাইফেল হাতে ঘুরছে,—তোমরা কি এখনো মুখবুজে সহ্য করবে? আমাদের কি শহরের যাওয়ার অধিকারটুকুও ওরা কেড়ে নেবে? এস, আমরা সৈন্যদের সংগীন তুচ্ছ করে বরফের ওপর দিয়ে ওপারে চলে যাই!"

"হাঁ, হাঁ, চল আমরা বরফের ওপর দিয়ে ওপারে যাই। হুর্‌রে।" দু-তিনজন লোক ঢালু পার বেয়ে ব্রিজের তলায় নেমে গেল। সৈন্যরা নিচু হয়ে দেখছে, সামরিক কর্মচারীর স্বর শোনা গেল: "ফের, তোমরা ফের। নইলে আমরা গুলি চালাতে বাধ্য হব।"

তারা ফিরেও তাকালো না, ঘন কুয়াশায় বরফের ওপর কালো বিন্দুর মত তাদের দেখা যাচ্ছে। জনতার চিৎকার, একজন সৈনিক রাইফেল তুলে তাগ করলো। আর একজন তাকে বারণ করছে। বিন্দু তিনটি ঘন কুয়াশার আড়ালে এবার লুকিয়ে গেল।

পথে যারা বেরিয়েছে তাদের কারুর কোন উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু অবরুদ্ধ ব্রীজ বা চৌ-মাথার মোড়ে এসেই তাদের কর্মসূচি স্থির হয়ে যাচ্ছে: তারা অবরোধ ভাঙবে। তা ছাড়া আছে গুজব, গুজব তাদের উত্তেজিত করে তুলছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যের দিকে প্যাভলভস্ক রেজিমেণ্ট নেভস্কির ভিড়ের উপর গুলি চালালো। পেট্রোগ্রাদের অধিবাসীরা জানলো, বিপ্লব এসেছে, বিপ্লব।

কিন্তু কেউ জানে না, বিপ্লবের শিকড় কোথায়,—এমন কি, সেনাদলের অধিনায়ক, পুলিশের বড়কর্তারাও না। বিপ্লবের শিকড় রয়েছে প্রতি গৃহে, প্রতি মানুষের বুকে, এতদিন বিদ্বেষে অসন্তোষে সে শেকড় দৃঢ় হচ্ছিল, এবার তার অংকুরোদ্গম। পুলিশ অনেককে গ্রেপ্তার করলো, কিন্তু বুঝতে পারলো না যে, বিপ্লবের মূল উচ্ছেদ করতে হলে পেট্রোগ্রাদের সমস্ত অধিবাসীকে জেলে পুরতে হয়।

তেলেগিণ সারাদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটালো। পুলিশের গুলি জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারে নি। তারা এখনো পথের ধারে ধারে জটলা করছে। ভ্লাদিমির ষ্ট্রীটের কোণে দুটি মৃতদেহ পড়ে আছে: একটি যুবতী আর একটি বৃদ্ধ। সেখানে ভীষণ ভিড় জমেছে। পুলিশ আবার গুলি চালালো। জনতা ছত্রভংগ, আহতের আর্তনাদ উঠছে।

সন্ধ্যের দিকে সব ঠাণ্ডা। পথে আজ আর আলো জ্বলেনি, দু-ধারে বাড়িগুলির জানলা বন্ধ। মোড়ে মোড়ে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে পুলিশের টুপির চূড়া, ক্লান্ত জনতা ঘরে ফিরে গেছে। আকাশে এক ফালি চাঁদ। ট্রাম লাইন আর সংগীনের ওপর আলো পড়ে চক্ চক্ করছে। বাড়িগুলো নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ভিতরে বাজছে টেলিফোন, আজকের ঘটনা নিয়ে চলেছে আলোচনা।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারী আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো ব্যাপার। পথে পথে সৈন্য সমাবেশ, জনতার ভিড়, চিৎকার, শপথ-ধ্বনি, বন্দুকের শব্দ ··। কিন্তু জনতা আজ শুধু আইন অমান্যই করলো না, তারাও পাল্টা পুলিশ আর সৈন্যদের আক্রমণ করলো। বরফের টুকরো আর পাথর তাদের অস্ত্র। শোনা গেল, সৈন্যদলেও নাকি

এই অসন্তোষ সংক্রামিত হয়েছে, কয়েকটা দল নাকি গুলি চালাতে নারাজ। তেলেগিণ এই বিপ্লবের মধ্যে মস্কো যাত্রা করলো।

উনত্রিশ

ডাশা আর কাটিয়া সভায় গিয়ে যখন পৌছলো তখন কে একজন বক্তা বলছেন :

ঘটনা-প্রবাহ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। গত কাল পেট্রোগ্রাদে সমস্ত ক্ষমতা জেনারেল খাবালভের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তিনি এই মর্মে আদেশ জারি করেছেন : গত ক'দিন ধরে জনতা সামরিক ও পুলিশ কর্মচারীদের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে। সুতরাং আজ থেকে জনতাকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হল। পেট্রোগ্রাদের অধিবাসী সাবধান। পথে পথে সৈনিক মোতায়েন করা হয়েছে, শান্তিরক্ষার জন্য যে-কোনো উপায় অবলম্বন করবার ক্ষমতা তাদের উপর ন্যস্ত।

"খুনের দল।" হলের পেছন থেকে কে যেন বল্ল।

" এই ঘোষণাপত্রে উলটো ফল ফলেছে। পঁচিশ হাজার সৈনিক বিপ্লবীদের সংগে যোগ দিয়েছে "

চারদিক থেকে হর্ষধ্বনি উঠলো। বক্তা হাত তুলে বল্লেন : "আপনারা চুপ করে শুনুন, আরো খবর আছে।'

"ডুমার সভাপতি রডজিয়ানকো জারের কাছে এই মর্মে তার করেছেন :

"অবস্থা খারাপ. রাজধানী বিপন্ন, রাজ্য সরকার পংগু, নতুন শাসনতন্ত্র গড়ে তোলবার অনুমতি দিন "

বক্তা একটু থেমে দর্শকদের দিকে তাকালেন।

আমরা আজ ইতিহাসের এক মহান পর্যায়ে এসে পৌছেছি। যুগযুগান্ত ধরে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, আজ তা সফলতা লাভ করেছে। ডিসেমব্রিস্টদের আত্মা তৃপ্ত হয়েছে .।

"ঈশ্বর আছেন।" মেয়েলিকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল।

" হয়ত, কালই সমস্ত রাশিয়া স্বাধীনতা-মন্ত্রে একীভূত হয়ে যাবে।"

"স্বাধীনতা। আমরা স্বাধীনতা চাই"—অনেক উত্তেজিত স্বর।

বক্তা বসে পড়লেন। একজন লম্বা লোক এবার মঞ্চে আবির্ভূত হল। কারো দিকে না তাকিয়ে সে বলতে লাগলো :

"এই মাত্র আপনাদের স্বাধীনতার কথা শুনে আশান্বিত হয়েছি। হাঁ, এই ত চাই। আমরা দ্বিতীয় নিকোলাইকে বন্দী করব, তার মন্ত্রীদের হত্যা করব, পুলিশ আর শাসনকর্তাদের লাথি মেরে বিদায় করে দেব—উড়বে স্বাধীনতার রক্ত নিশান। চমৎকার! বিপ্লবের প্রথম আঘাত চিরদিনই গলিতপ্রায় শাসন-

তন্ত্রের ওপর পড়ে। সুতরাং আরম্ভ বেশ আশাপ্রদ হয়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত বক্তা রাশিয়ার স্বাধীনতা মন্ত্রে মহামিলনের যে স্বপ্ন দেখছেন

বক্তা হাসলেন। ডাশা পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করলো: "কে বলছেন?"

"কমরেড কুজমা," ফিস ফিস করে কে বল্ল, "সবে নির্বাসন থেকে ফিরেছেন।"

"· সে স্বপ্নে আবেগ আছে, স্বীকার করি রক্তস্রোত দ্রুত তালে নেচে ওঠে সেই মহামিলনের কথায়," কমরেড কুজমা বলতে শুরু করলেন, "কিন্তু বক্তা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, সে স্বপ্ন সফল হতে আজ পারে না। আজও লাখে লাখে চাষী সীমান্তের বধ্য-ভূমিতে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, লাখে লাখে শ্রমিক সংকীর্ণ অন্ধকূপে আলোবাতাস না পেয়ে মরছে, কিউতে দাঁড়িয়ে আছে বুভুক্ষুর দল। আজ স্বাধীনতার স্বপ্ন বিলাস নয় বন্ধুগণ, আজ "

চিৎকার শোনা গেল: "বসে পড়, আমরা তোমার কথা শুনতে চাই না।"

"সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের আগুন জালিয়ে দিয়েছে। বুর্জোয়া সমাজ এই সুযোগে পৃথিবীর বাজারে দু হাতে পয়সা লুটবার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। সোসাল ডেমোক্রাটরা বলছে, যুদ্ধে যোগ দাও। চাষা আর শ্রমিকের দল খাদ্যাভাবে দলে দলে সাম্রাজ্যবাদীর এই মারণযজ্ঞে জীবন বিসর্জন দিতে চলেছে। এখন কি মহামিলনের স্বপ্নে বিভোর থাকতে চান আপনারা? ·· "

"লোকটা কে হে?" ঘাড় ধরে নামিয়ে দাও।" বিভিন্ন কণ্ঠের ক্রুদ্ধ চিৎকার।

কুজমা বলতে লাগলেন। "সময় এসেছে, চরম মুহূর্ত, পরমক্ষণ। বিপ্লবের যে আগুন বুদ্ধিজীবী আর বুর্জোয়াদের মধ্যে জ্বলে উঠেছে, তাকে জীইয়ে রাখতে হবে, চাষা আর মজুরদের হৃদয়ে জ্বালাতে হবে বিপ্লবের শিখা, তবেই ত, স্বাধীনতার স্বপ্ন হবে সার্থক।"

কুজমা থামলেন, মঞ্চে তার স্থান গ্রহণ করলেন একটি মহিলা। তিনি বলতে শুরু করলেন: "আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে কথা ...

ডাশা শুনতে পেল পেছনে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে।

তেলেগিণ। ডাশা পেছনে তাকিয়ে দেখলো।

ওরা সভা ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো। নির্জন পথ, নীল আকাশে চাঁদ, বরফ জ্বলছে চাঁদের আলোয়।

"কতদিন পরে তুমি এলে।" ডাশার স্বর আবেগে উচ্ছ্বসিত।

"প্রতি মুহূর্তে আসতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি ··

"তুমি রাগ করনি ত আমার চিঠি পেয়ে? আমি চিঠি লিখতে এখনও শিখিনি ..."

তেলেগিণ ডাশাকে কাছে টেনে চুমু খেল ওর ঠোঁটে, চুলে।

নীরবতা জমে উঠেছে ; বরফ পড়ছে। চাঁদের ওপর একখণ্ড মেঘ। ডাশা আর তেলেগিণ পথ চলছে, কারো মুখে কথা নেই। এই বিপ্লবের ঝটিকার নিচে তারা মিলতে চায়।

ত্রিশ

তেলেগিণের হোটেলের জানলায় দাঁড়িয়ে কাটিয়া, ডাশা আর তেলেগিণ দেখছিল জনস্রোত চলেছে। গুজব, আজ তারা ক্রেমলিন আর অস্ত্রাগার আক্রমণ করবে।

"উঃ কি ভীষণ!" কাটিয়া হঠাৎ কেঁদে উঠলো।

"কোনো ভয় নেই," তেলেগিণ সান্ত্বনা দিল, শহর বেশ ঠাণ্ডা। আমি শুনলাম, সরকার নাকি ক্রেমলিন আর অস্ত্রাগার বিনাবাধায় ছেড়ে দেবে।"

"কিন্তু ওরা, ওরা ছুটছে কেন?" কাটিয়া ফোঁপাচ্ছে।

ডাশা তাকিয়ে দেখলো, ক্রেমলিনের চারপাশে জনস্রোত পিঁপড়ের মত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি হয়ত গুলি চলবে, উঠবে মরণাহতের গোঙানি, ক্রেমলিনের সোপানে পড়বে রক্তলেখা। কোনো আশা নেই আর ···

ডাশার মনে হল, নদীর বরফ গলে দু-কূল ছাপিয়ে প্রবল বন্যা নেমেছে, তারই স্রোতে ভেসে চলেছে তেলেগিণ।

ডাশাও সে স্রোতে ভেসে যাবে তারই সংগে। আর কোনো উপায় নেই ···

কাটিয়া, ডাশা আর তেলেগিণ পথে বার হল। প্রতি মুহূর্তে জনস্রোত বাড়ছে, শহরতলী আর গ্রাম থেকে বাল-বৃদ্ধ-নরনারীর দল এসে জুটেছে! সবার মুখেই উত্তেজনার ছোপ। যুগ যুগান্তের নিপীড়নের পর আজ এসেছে মুক্তির বায়ু। আজ আর সংযম নেই। একদল পুলিশকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে কয়েকজন ছাত্র, তাদের নেতৃত্ব করছে একটি সুন্দরী মেয়ে, হাতে তার মুক্ত তরবারি। বন্দীদের একজনের কপালে ক্ষত, রক্ত জমে কালো হয়ে উঠেছে।

"কেমন মজা!" কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো।

"এতদিন আমাদের ওপর জুলুম চালিয়েছ, এবার?"

"ওরা নিজেদের এক একটা জার মনে করত!"

"কমরেড, কমরেড, পথ দাও, গোলমাল কোরো না," একদল ছাত্র জনতার ভেতর দিয়ে পথ করে চলেছে।

তেলেগিণরা এবার গভর্ণর জেনারেলের বাড়ির কাছে এল। স্কোবেলেভের মূর্তি ভেঙে পড়ছে ; উত্তেজিত জনতার চিৎকার। গভর্ণর—জেনারেলের বাড়ির ভেতর থেকে এক ঝলক ধোঁয়া বেরিয়ে এল। কারা যেন আগুন লাগিয়ে

দিয়েছে। বুলভারে পুষকিনের মূর্তির চারপাশে জনতা। একজন বিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক সেখানে জীবনের এই নতুন অধ্যায় সম্বন্ধে দু-চার কথা বলছেন, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ছাত্রদের সাহায্যে পুষকিনের মূর্তির হাতে একটা রক্ত নিশান গুঁজে দেয়া হল। জনতা চিৎকার করে উঠলো। সারা শহর যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। রাত হয়ে এসেছে, তবু তারা ঘরে ফিরছে না। পথের মোড়ে মোড়ে কথা বলছে, কাঁদছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে।

সন্ধ্যে হতেই তেলেগিণরা বাড়ি ফিরলো। লিজা বাড়ি নেই, পাচিকা মাতুর্সা রান্নাঘরে দোর বন্ধ করে কাঁদছে। কাটিয়া অনেক অনুরোধ করবার পর সে দোর খুললো।

"কি হয়েছে মাতুর্সা?"

"ওরা জারকে খুন করেছে," মাতুর্সা কাঁদতে কাঁদতে বল্ল।

"কি বাজে বকছ! তিনি এখনো বেঁচে আছেন।"

মাতুর্সা চলে গেল। ডাশা ডিভানের ওপর এলিয়ে পড়লো, তেলেগিণ তার পাশে। ঘুমে চোখ বুজে আসছে ডাশার, আবছা অন্ধকারে ওর চুলের মত শাদা স্কার্ফখানা দেখা যাচ্ছে। তেলেগিণ তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। কাটিয়া ঘরে ঢুকে তেলেগিণের পাশে বসলো।

"ডাশা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা, কি হবে বলুন ত? কোন ভাবেই নিকোলাইকে আমার নামে একটা তার করে দিন। ওর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছি। তারপর আপনারা দুজনে কবে পেট্রোগ্রাড যাচ্ছেন?"

তেলেগিণ চুপ করে রইলো, কাটিয়া ওর দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটি ডাশার মতই আয়ত, কিন্তু সেখানে পরিপূর্ণ নারীত্বের ইংগিত।

পরদিন সকাল থেকে পথে আবার ভিড়। দোকানীরা মই দিয়ে দোকানের সাইনবোর্ডের ওপর আঁটা রাজকীয় ঈগল-চিহ্ন খুলে নিচ্ছে, বুলভার কাঁপিয়ে চলেছে মিলিটারী লরির সার। কয়েকটি যুবতী স্বেচ্ছাসেবিকা খোলা তলোয়ার হাতে শান্তিরক্ষা করছে। একটা তামাকের কারখানা থেকে মিছিল বেরিয়েছে। অনশন-ক্লিষ্ট, যক্ষ্মা রোগীর মত ম্লান চেহারা মেয়ের দল লিও টলস্টয়ের ছবি নিয়ে গান করতে করতে চলেছে। টলস্টয়ের চোখ দুটি ভ্রুকুটি-কুটিল! আর যুদ্ধ হয়ত হবে না, বিদ্বেষ কালো করে তুলবে না মানুষের হৃদয়, এখন শুধু বাকি লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেয়া কোনো প্রাসাদ শিখরে। সমস্ত পৃথিবী তাহলে জানবে, আমরা সবাই ভাই, যুদ্ধ আমরা চাই না। আমরা চাই স্বাধীনতা, ভালোবাসা, জীবন।

তার এল : জার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন। গ্র্যাণ্ডডিউক সিংহাসনে বসতে রাজি হননি।

জনগণ এ সংবাদে কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলো না, একদিন তারা যে ঘূর্ণীর মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, সেখানকার অভিধানে বিস্ময় বা অসম্ভব ব'ল কোনো পরিভাষা নেই।

দিন শেষ হয়ে গেছে, আকাশে ফুটছে তারা। দিগন্তে এখনো শেষ সূর্যের কমলা রঙের ক্ষীণ আভাস। ডাশা আর তেলেগিণ প্রকাণ্ড গীর্জার সমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকার নেমে আসছে, গীর্জায় সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বেজে উঠলো, ঢং ঢং ঢং ··· তেলেগিণের চোখের সমুখে ভেসে উঠলো : ভাঙা গীর্জা, মৃত সন্তানকোলে মা। তেলেগিণ ডাশার হাত ধরলো।

"তুমি কি এখনি চাও?" ডাশা ফিস ফিস করে বল্ল। "এখুনি? কিন্তু এই অসময়ে কি পাদরীকে পাওয়া যাবে?"

"না, না, বিয়ের কথা নয়," তেলেগিণের স্বর কেঁপে উঠলো, "আমি বড় অসহায় ডাশা, আমাকে তুমি ছেড়ে যেয়ো না।"

একত্রিশ

"নাগরিকগণ, আপনাদের কাছে যে সংবাদ আমি আজ বহন করে এনেছি তার জন্য নিজেকে আমি গৌরবান্বিত মনে করছি। সে সংবাদ হচ্ছে এই : দাসত্বের শৃংখল ভেঙে গেছে। তিন দিনে, বিনারক্তপাতে রুশজনগণ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবকে সার্থক করে তুলেছে। জার দ্বিতীয় নিকোলাই সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, তার মন্ত্রীবর্গ বন্দী, গ্র্যাণ্ডডিউক সিংহাসনে বসতে নারাজ। এখন জনগণের ওপর সম্পূর্ণরূপে পড়েছে শাসনের ভার। সাময়িক ভাবে এক অস্থায়ী শাসনতন্ত্র এখন কাজ চালাচ্ছেন, কিন্তু শীঘ্রই নির্বাচনের দিন আসছে তখন সর্বসাধারণের ভোটে শাসনতন্ত্র পুনর্গঠিত হবে।"

নিকোলাই আইভানোভিচ বক্তৃতা থামিয়ে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। তাঁর পেছনে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যাধ্যক্ষ টেটকিন। নিরস্ত্র রাজকীয় সেনাদল অবাক হয়ে শুনছে বক্তৃতা। দূরে ধূসর কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা চিমনির চূড়া দেখা যাচ্ছে। ওপাশে জার্মান লাইন।

"সৈনিকগণ।" নিকোলাই আবার বলতে লাগলেন, "কাল পর্যন্ত তোমরা ছিলে জারের মারণযজ্ঞের বলি। তারা তোমাদের জানিয়ে দেয়নি, কিসের জন্য তোমরা যুদ্ধ করছ ··· সামান্য অপরাধের জন্য তারা বিনা বিচারে কুকুরের মত তোমাদের গুলি করে মেরেছে। আমি অস্থায়ী শাসনতন্ত্রের পশ্চিম সীমান্তের কমিসার হিসাবে তোমাদের জানাচ্ছি, আজ থেকে সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে

কোনো প্রভেদই রইলো না। 'হুজুর', 'মান্যবর' এসব সম্ভাষণ আজ থেকে তুলে দেয়া হল। তাদের অভিবাদন করাও নিষিদ্ধ হল। আমরা সবাই বলব ভাই, জেনারেল আর একজন সামান্য সৈনিকে আজ আর তফাৎ নেই। তোমরা ইচ্ছে করলে একজন জেনারেলের সংগে করমদন করতে পার।"

ভিড়ের মধ্যে হাসির শব্দ শোনা গেল।

"হা, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খবর এইবার তোমাদের শোনাচ্ছি, এতদিন রাজকীয় শাসনতন্ত্র যুদ্ধ চালিয়েছে, এবার চালাবো আমরা সবাই। সমর-পরিষদে সকলেরই অধিকার থাকবে, তোমরা তোমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি সেখানে পাঠাবে। এখন থেকে মানচিত্রে সৈন্যাধ্যক্ষের পেন্‌সিলের পাশে সৈনিকের আংগুলও দেখা যাবে। সৈনিকগণ, এই বিপ্লবের জন্য আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বক্তৃতা থেমে যেতেই ভিড়ের ভেতর থেকে অনেক কণ্ঠস্বর এক সংগে শোনা গেল।

"জামানদের সংগে শীগগির সন্ধি হবে কি ?"

"এক একজনকে কত মর্যদা দেয়া হবে ?"

"মিঃ কমিসার, কোর্ট-মার্শালে কি চুরিরও বিচার হবে ?

'আমার একটা নালিশ আছে ..."

"আমি ছুটি চাই।"

'আজ তিনমাস ট্রেঞ্চে পচছি

"মিঃ কমিসার, রাজা কে হবে ?'

ওদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য নিকোলাই মঞ্চ থেকে নিচে নেমে এলেন। সৈনিকরা তাকে ঘিরে ফেলেছে। একজন সৈনিক তাঁর বেল্ট চেপে ধরে বল্ল :

"আমার কথার উত্তর দিয়ে যেতে হবে। গ্রাম থেকে চিঠি এসেছে— গরুগুলো মরে গেছে, আমার বৌ ছেলে-পুলের হাত ধরে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। মিঃ কমিসার, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, দলছেড়ে গেলে এখনও গুলি করবার হুকুম হবে ?"

"স্বাধীনতার থেকেও যদি তোমার নিজের মংগল তোমার কাছে বড় হয়ে ওঠে, তাহলে দূর হও তুমি। কিন্তু রাশিয়া তোমাকে চিনে রাখলো দেশদ্রোহী! যাও, বাড়ি যাও!" নিকোলাই চিৎকার করে উঠলো।

"কেন আপনি মিছামিছি চিৎকার করছেন ?"

"কে আপনি যে এমন করে কথা কইছেন ?"

"সৈন্যগণ!" নিকোলাই গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ভিড়ের ভেতর দাঁড়ালেন। "তোমরা ভুল বুঝেছো। বিপ্লবের প্রথম আদেশ হচ্ছে, মিত্রপক্ষকে সাহায্য করা।

আমাদের স্বাধীন সেনাদলকে স্বাধীনতার চিরশত্রু জর্মানদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, দ্বিগুণিত উৎসাহে লড়তে হবে।"

"ট্রেঞ্চে কি কখনও উকুনের কামড় খেয়েছো?" কার ব্যাঙ্গোক্তি যেন। "উকুনের কামড় খেলে আর যুদ্ধের কথা বলতে হত না।"

"স্বাধীনতার কথা আমাদের শুনিও না, যুদ্ধের কথা বল। তিন বছর যুদ্ধ করছি, আমরা জানতে চাই কবে যুদ্ধ শেষ হবে?"

"সৈনিকগণ।" নিকোলাই বল্লেন, "বিপ্লবের পতাকা উড়েছে, যুদ্ধে জয়লাভের আর দেরি নেই।"

"পাগলের প্রলাপ।"

"তিন বছর যুদ্ধ করলাম, কিন্তু জয়ের কোনো চিহ্নই দেখলাম না।"

"যুদ্ধই যদি করতে হয়, জার কি দোষ করেছিলেন?"

"তিনি আর যুদ্ধ চালাতে চাননি বলে জারকে ওরা সরিয়ে দিয়েছে।'

"ভাই সব, বেটা গোয়েন্দা।"

"তুমি কি জন্য এসেছ, আমরা বুঝতে পেরেছি।"

"সৈন্যাধ্যক্ষ টেটকিন দেখতে পেল, একজন গোলন্দাজ নিকোলাইর কোটের কলার চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে আর বলছে: "কেন তুই এখানে এসেছিস? বল্, কেন তুই এখানে এসেছিস?"

নিকোলাইর মাথা একপাশে ঢলে পড়েছে, দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়, গোলন্দাজটা তার ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ খুলে নিয়ে তাঁর মাথায় বেদম মারছে।

বত্রিশ

কাটিয়া একা ফিরলো স্টেশন থেকে। তেলেগিণ আর ডাশা বিয়ের পর আজ পেট্রোগ্রাডে চলে গেল।

বাড়িটা একেবারে নিঝুম। মাতুর্সা আর লিজা কোথায় বেরিয়েছে। খাবার ঘরে এখনো সিগারেট আর ফুলের গন্ধ। কাটিয়া জান্লার ধারে বসলো। আকাশে মেঘ করে আসছে। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে, তার বুক যন্ত্রণায় খান খান হয়ে গেলেও ওর টিক্ টিক্ থামবে না। কাটিয়া অনেকক্ষণ বসে রইল, তারপর উঠে ডাশার ঘরে গেল। শূন্য ঘর। ছেঁড়া কাগজ বাতাসে উড়ছে, টুপি রাখবার বাক্সটা খালি। ডাশা, ডাশা চলে গেছে। কাটিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

খাবার ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজলো। রান্নাঘরে গিয়ে কাটিয়া দেখলো, লিজা আর মাতুর্সা এখনো ফেরেনি; কাটিয়া একটা কাগজ নিয়ে লিখলো:

"লিজা, মার্তুসা, এতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকার জন্ত তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।" টেবিলের ওপর কাগজটা রেখে নিজের ঘরে এসে সে শুয়ে পড়লো।

ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ পরে সে শুনতে পেল দরজা বন্ধের শব্দ। লিজা আর মার্তুসা ফিরেছে। ওরা হাসছে, তার লেখা পড়ে নিশ্চয়ই! এবার ওরাও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়িতে একটা বাজলো ঢং করে। কাটিযা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে আলো জ্বালালো। প্রকাণ্ড আয়না, তার ছায়া পড়েছে। সেমিজের অন্তরাল থেকে উপচে পড়ছে পাকা ফলের মত স্তনযুগল; একগোছা চুল কাঁধের পাশে নেমে এসেছে। চুলের গোছা হাত দিয়ে ধরে অনেকক্ষণ সে দেখলো। "হাঁ, হাঁ, আছে, আছে।" আয়নায় মুখের ছায়া ভাসছে। "এ কবছরে চুল সব পেকে যাবে, বুড়ো হয়ে যাব।" আলো নিভিয়ে সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। "ভালোবাসা, সুখ, শান্তি আমার জীবনে মুহূর্তের জন্যও এল না ··"

আলিয়োশা!··· লাইমগাছের সার, বৃষ্টি-ভেজামাটি, আলিয়োশা সাইকেল থেকে লাফিয়ে পড়ে কাটিযার কাছে এল। "··· আমি জানি কাটিযা, তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তবু আমি তোমাকে ভালোবাসি।" আলিযোশা মিলিয়ে গেল। কাটিযা চিৎকার করে বল্ল, "আলিযোশা, যেও না, যেও না!"

সত্যিই কি একদিন আলিয়োশা তাকে ভালোবেসেছিল? কিসের শব্দ না?

"কে?"

"আমি লিজা, আপনার তার এসেছে।"

কাটিয়া খাম খুলে তার পড়লো, তারপর লিজার দিকে চেয়ে বল্ল, লিজা, "নিকোলাই মারা গেছে।"

লিজা নিঃশব্দে চলে গেল, কাটিযা আবার পড়লো? "নিকোলাই আইভানোভিচ দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর দেহ মস্কৌ আনার যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করবেন।"

কাটিয়ার মাথা ঘুরছে, চোখের সমুখে দুলছে পর্দা, আঁধারের পর্দা। সে মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

পরদিন নিকোলাইর মৃতদেহ বিরাট মিছিল করে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হল। শবাধার নামানোর পর দু-একজন নিকোলাই সম্বন্ধে কিছু বল্লেন। একজন তাকে তুলনা করলেন বিরাট আলবাট্রস পাখীর সংগে, আর একজন বল্লেন, নিকোলাই একজন যাত্রী। মশাল হাতে করে তিনি দুর্গম শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলেছিলেন। একজন বেঁটে লোক, হোমরা-চোমরা কেউ হবেন, একটু দেরি করে এসে হাজির হয়ে একজন বক্তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন যে, নিকোলাই শোচনীয় মৃত্যু দ্বারা তাঁর দলের কৃষি-সমস্যা সমাধান-প্রণালীকে সমর্থন করে গেছেন। কাটিয়ার

এসব ভালো লাগছিল না। সে অলক্ষ্যে ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে বাড়ি চলে গেল।

যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন চারিদিকে বেশ আঁধার। প্রথম সে মনে করতে পারলো না, কি হয়েছে তার, ধীরে ধীরে তার মনে হল: ... সেই বিকৃত মুখ ·· গোরস্থান ওদের বক্তৃতা। কাটিয়া বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ওষুধের বাক্স থেকে একটা একটা করে শিশি তুলে দেখতে লাগলো। মরফিয়া, একটু মরফিয়া তার চাই। অন্তত, কিছুক্ষণের জন্য ও বিস্মৃতি, শান্তি। মরফিয়ার শিশিটা নিয়ে সে একবার শুঁকে দেখলো, তারপর একটা গেলাস আনতে খাবার-ঘরের দিকে চলে গেল। খাবার-ঘরে আলো জ্বলছে। কাটিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো, "কে, লিজা?" দোরটা একটু ফাঁক করতেই সে দেখতে পেল, ডিভানে একটি সামরিক কর্মচারী বসে আছে।

"কে, কে?"

কাটিয়া এবার চিনতে পারলো, বোশিন, বোশিন।

"আমি দেখা করতে এসেছিলাম। এসেই শুনলাম, তোমার বিপদের কথা। চলে যেতাম, কিন্তু মনে হল, এই বিপদে কে তোমাকে দেখবে কাটশা।" বোশিন কাটিয়াকে জড়িয়ে ধরলো।

কাটিয়া ওর বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছে।

তেত্রিশ

ডাশা জানলার ধারে বসেছিল। আজ বিকেলেই তারা পেট্রোগ্রাদে এসে পৌঁছেছে। বাইরে সূর্য ডুবছে, দেয়ালে শেষ আলোর কম্পন। তেলেগিণ পাশে বসে আছে ডাশার মুখের দিকে চেয়ে।

"কি বিষণ্ণ সূর্যাস্ত!" ডাশা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

তেলিগিণ মাথা নাড়লো।

"গান গাইতে ইচ্ছে করছে," ডাশা বল্ল। "কতদিন পিয়ানো ছুঁইনি জান? যুদ্ধ বাঁধবার পরে আর একটি বারও না। যুদ্ধ, যুদ্ধ কবে শেষ হবে কে জানে।"

তেলেগিণ তবু নিরুত্তর।

"যুদ্ধ শেষ হলে আবার গান শিখব। তোমার মনে পড়ে আইভান, সেদিনের কথা? সমুদ্রের পারে আমরা দু-জন, ফুলে উঠেছে সমুদ্র—হালকা নীল তার রং; আমার কি মনে হয়েছিল জান, আমি যেন যুগযুগ ধরে তোমাকে ভালোবেসেছি।"

তেলেগিণ কি বলতে গেল, কিন্তু ডাশার হঠাৎ মনে পড়লো: "ঐ যা, কেটলীর জল এতক্ষণে গরম হয়ে গেছে!"

ডাশা চলে গেছে পাশের ঘরে। তেলেগিণ চোখবুজে সোফার এক কোণে বসে রইলো। ডাশা ঘরে নেই, কিন্তু তার গায়ের মৃদু সুগন্ধে ঘর এখনো ভরে আছে। পাশের ঘরে তার পায়ের শব্দ…চায়ের পেয়ালার টুং টুং …!

"চোখবুজে বসে কি ভাবছ?" কখন ডাশা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। "তোমার কথা।" তেলেগিণ হাসলো।

"জানি গো জানি, আমার কথা ছাড়া আর কি ভাববে?" ডাশা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

"ভাবছিলাম, তুমি আমার স্ত্রী হলে, অথচ কি বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়লে আমার কাছে?"

"ওমা তাও জান না? প্রেমের বাঁধন, বিশ্বাসের বাঁধন!"

"ডাশা, তুমি আমাকে ভালোবাসো?" তেলেগিণ জিজ্ঞাসা করলো, ভাবালুতায় কেঁপে উঠছে তার স্বর।

"ওকথা এখনো জিজ্ঞাসা করছ তেলেগিণ?" ডাশার স্বরেও আবেগ, কেন তুমি কি জান না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আর আমার সে ভালোবাসা অটুট থাকবে সে দিনও যে দিন বাট গাছের কাছে গিয়ে পৌছব।"

"বাট গাছ, কোন বাট গাছ?"

"কেন দেখনি?—মৃতের কবরের ওপর বাট গাছের ডাল নুয়ে পড়ে আছে, যেন কাঁদছে!"

তেলেগিণ ডাশাকে কাছে টেনে নিয়ে এসে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিল। ডাশা তার বুকে কান পেতে শুনছে উত্তাল রক্তের গান। ইন্দ্রিয়ের মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে এবার। সুন্দর মৃত্যু!

পাঁচদিন পরে কাটিয়ার চিঠি এল নিকোলাইর মৃত্যু সংবাদ বহন করে।

"… মৃত্যু সংবাদ যখন পেলাম, মনে হল সব শেষ হয়ে গেছে। চিরদিন আমাকে এই পৃথিবীতে একা কাটাতে হবে। ভেবে দেখ বোন, কত ভয়ংকর সেই নিঃসংগতা! বিষণ্ণ শীতের মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে যাবে, প্রাতে তখন কেউ নেই পাশে; বসন্তের উন্মন হাওয়ায় যখন আর্তনাদ করে উঠবে হৃদয়, চাইবে প্রেম—তখনো কেউ নেই! কিন্তু আমি খুঁজে পেয়েছি তাকে—আর ত আমি নিঃসংগ নেই! জীবনের গান, ভালোবাসার গান সে আমাকে শুনিয়েছে।"

কাটিয়া কি আবোল-তাবোল বকেছে চিঠিতে, নিশ্চয়ই ও খুব আঘাত পেয়েছে। ডাশা ঠিক করলো কাটিয়ার কাছে যাবে। পরদিন আর একখানা চিঠি এল। কাটিয়া পেট্রোগ্রাডে আসছে, ডাশাকে সস্তায় ঘর দেখতে লিখেছে। পুনশ্চয় লেখা: "রোশিন এখন পেট্রোগ্রাডে আছে। তোমার সংগে দেখা করে সে সব বলবে। তার মত বন্ধুও আর দেখলাম না।"

এপ্রিলেব এক ববিবাবেব সকাল। ছেঁড়া মেঘেব ফাটলে আকাশেব নীলদ্যুতিব ইংগিত, সূর্যেব সোণালি আলো। তেলেগিণ আব ডাশা বেড়াতে বেবিয়েছে। পাইনেব সাবি সাবি গাছ চলে গেছে, বিবর্ণ লালচে পাতাগুলি হাওযায খসে পড়ছে, দূবে কোথায একটা ওবিওল ডাকছে, শব্দ তরংগ ছড়িয়ে পড়ছে।

"আইভান।" ডাশা ডাকলো।

"কি?"

"কিছু না, আমি ভাবছি।"

"কি ভাবছ ডাস্থশা?"

"পবে বলব"

"আমি জানি।"

"না, তুমি জান না।"

একটা বড পাইন গাছেব কাছে ওবা এসে দাঁড়িয়েছে। বিবর্ণ লালচে পাতা ঝরে পড়ছে, সকালেব সোনালি আলো তাব ওপব।

"আমি জানি ডাস্থশা।" তেলেগিণেব দৃষ্টি প্রেমাতুব। ডাশা ফিসফিসিযে বল্ল, "আমি যেন আজ কাণায কাণায ভবে উঠেছি আইভান। এত সুখ, এত আনন্দ।"

ওবা নীবব হয়ে গেল। ঘাসেব ওপব দিযে এবাব পাশাপাশি চলেছে। হাওযায উড়ছে ডাশাব স্কার্ট। একটা পুবনো প্রাসাদ, বিবর্ণ ফটক, পাথব বাঁধানো জীর্ণ পথ-বেখা। ডাশা হঠাৎ বসে পড়লো, একটা নুড়ি ঢুকেছে তাব জুতোব তলায। তেলেগিণ জুতো খুলে দিল। শাদা মোজাব নিচে সুডৌল উত্তপ্ত পা—তেলেগিণ বাববার চুমু খেল। ডাশা ডাকলো, "তেলেগিণ।"

"কি বলছ?"

তেলেগিণকে কাছে টেনে এনে বুকেব ওপব ডাশা তাব মাথা চেপে ধবলো। "তেলেগিণ।.."

"বল"

"আমাব লজ্জা কবছে।"

"লজ্জা কি ডাস্থশা?" তেলেগিণ বল্ল।

"আমি " জড়িত স্খলিতস্বর ডাশাব। "আমি চাই সন্তান, তোমাব সন্তান।"

চৌত্রিশ

আবার পেট্রোগ্রাড! জ্নামেনস্কির সেই বাড়িটা; দরজায় পিতলের ফলকে নাম লেখা, "এন, আই, সমোকভনিকভ।" কাটিয়ার মনে হল, পুরনো বৃত্তে ঘুরবে আবার জীবন। সেই পুরনো দরোয়ান, মাঝরাতে দোর খুলে দিয়ে তাকে যে সেলাম জানাত; সিঁড়ির আলোটা জ্বালাত। সবই তেমনি।

কাটিয়া ডাশাকে নিয়ে হলে ঢুকলো, জান্‌লা বন্ধ, কেমন একটা গন্ধ উঠছে। আলো জ্বাললো কাটিয়া। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে দুটো ফুল একটা মিমোসার শুকনো ডাল, অতীতের চপল নাগরিক জীবনের উদাসীন সাক্ষী তারা। চেয়ারগুলো দেয়ালের কাছে সরানো, আলমারির ভেতরে শাম্পেনের গেলাসগুলি চক্‌চক করছে! প্রকাণ্ড ভিনিসীয় আরসিতে জমেছে ধূলো।

কাটিয়া নিস্পন্দভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

"ডাশা," অস্ফুট স্বরে সে বল্ল, "তোমার মনে পড়ে ডাশা, সেই সব দিনের কথা,—সেই সান্ধ্য মজলিস, ব্যারিষ্টাররা তর্ক করছে, তরুণ কবিরা কবিতা পড়ছে? কোথায়, কোথায় গেল সেই সব দিন!"

এবার ওরা ড্রয়িং রুমে ঢুকলো। কাটিয়া আলো জ্বালিয়ে একবার চারদিকে তাকালো। সেই চৌ-কোণ-পদ্ধতিতে আঁকা ভবিষ্যৎপন্থী চিত্রকরদের ছবি এখনো টাঙানো, কিন্তু তাতে আর জৌলুস নেই, মাকড়সার জাল আর ধূলোয় বিবর্ণ তারা।

ডাশা একটা ছবি দেখিয়ে বল্ল, "কাটুশা, এই ছবিটার কথা তোমার মনে আছে, 'আজকের ভেনাস'? একদিন আমার মনে হয়েছিল, ওরই জন্য আমাদের জীবনে এসেছে ঝড়।"

ডাশা পিয়ানোর স্বরলিপির ওপর চোখ বুলাচ্ছে। কাটিয়া তার নিজের ঘরে এল। তিন বছর আগে পেট্রোগ্রাড থেকে বিদায়ের দিন ঠিক এমনি ছিল ঘরখানি—সে দস্তানা দুটো নিতে এসে যেমনটি দেখেছিল। শুধু যেন একটা হালকা কুয়াশার আবরণ পড়েছে, সব কিছুর ওপর একটা ম্লানিমা। কাটিয়া পোষাকের আলমারির পাল্লাটা খুলে ফেললো; লেসের টুকরো, ছেঁড়া স্‌কার্ট, মোজা, হিল-ক্ষয়ে-যাওয়া জুতো, নানা টুকিটাকি। একটা সুগন্ধ উঠছে, কাটিয়া আংগুল দিয়ে নাড়লো; পরিচিত স্পর্শ, কত স্মৃতি ভিড় করে আসে!

হঠাৎ পিয়ানোর সুর ভেসে এল—ডাশা বাজাচ্ছে এক চিরপরিচিত গৎ। কাটিয়া পাল্লাটা সশব্দে টেনে দিয়ে ড্রয়িং রুমে ফিরে এল।

"কাটিয়া," ডাশা পেছন ফিরে বল্ল, "এইখানটা শোন ..."

"আমার বড্ড মাথা ধরেছে।" কাটিয়া সোফায় এলিয়ে পড়লো।

"কিন্তু জিনিসপত্র সবাবার কি ব্যবস্থা হবে ?"

"আমি এখানকার কোনো জিনিস আর ছুঁতে চাই না, শুধু পিয়ানোটা তোমাব ওখানে পাঠিয়ে দেব।"

কাটিয়া পেট্রোগ্রাডে এসেছে কয়েক দিন হল। এসে উঠেছে একটা ছোট কাঠের বাড়িতে। নিকোলাই সামান্য যা কিছু বেখে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই ফুবিয়ে গেছে। এবাব তাকে পুরনো বাড়িটা বিক্রী কবতে হবে। খবিদ্দাব ঠিক, এখন জিনিসপত্র-গুলো সরিয়ে ফেল্লেই হয। আজ তার ব্যবস্থা কবতেই এখানে আসা, কিন্তু জিনিস-পত্র ছুঁতে মন সবছে না। পুবনো দিনের স্মৃতি দিয়ে সে বিষাক্ত কবতে চায় না তাব ভবিষ্য জীবন।

তেলেগিণ আব ডাশা খাবাব ঘবে অপেক্ষা কবছিল। কাটিযা এসে ঢুকলো। নতুন টুপি, নতুন ওডনা, চোখে মুখে দীপ্তি।

"দেবি হযে গেল, না ?" ডাশাব কাছে গিযে সে বল্ল, "কি কববো, যে বৃষ্টি। জুতোটা ভিজে চুপসে গেছে।"

বাইবে প্রবল ধাবায বৃষ্টি পডছে, পৃথিবীব ওপব ঘনিয়ে এসেছে ধূসবতা। পাইপ দিয়ে ঝবঝব করে শাদা জল ঝবছে, হাওয়া বইছে, ঘর্ণীহাওযা। ছাতা-মাথায দু একটি পথিক, বিজলী ঝলক, বজ্রেব মত্ত হুংকার দিকে দিকে।

কাটিয়া ডাশাকে বল্ল: "কে আসছে আজ জান ?"

"কে, এই ঝড-জল মাথায় কবে কে আসবে ?"

"রোশিন, বোশিন আসবে লিখেছে।"

খাবার টেবিলে তেলেগিণ বল্ল তাদেব কাবখানাব কথা। চারদিকে বিশৃংখলা, কাজ বন্ধ, শুধু সভা আব সভা। বলসেভিকরা বলছে: বুর্জোযা সরকাবকে কোনো সুবিধে তারা দেবে না, কারখানাব কর্তৃপক্ষের সংগে কোনো চুক্তিতেই তাবা বাজি নয। তাদের এক কথা: সোভিয়েটেব হাতে ক্ষমতা আসুক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

"ওরা ক্ষেপে উঠেছে। আমি ওদেব ভুল বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। বললাম, ওরা যা করছে তাব ফল এই হবে যে, ছ'মাস পবে সারা রাশিয়া খেতে পাবে না। রুবিলিয়ভ আমার কথা হেসে উডিয়ে দিয়ে বল্ল, 'নতুন বছরে রাশিয়াব জমি আর কাবখানার মালিক হব আমরা, বুর্জোয়াদের ঠাঁই হবে না। কাজ কর, বাঁচ—জমি, কারখানা, পৃথিবী—সব তোমার। এই ত আমাদের বিপ্লবেব মূলমন্ত্র। নতুন বছরে সার্থক হবে এই মন্ত্র!" তেলেগিণ হাসলো।

"আমার মনে হয় দুঃখের দিন ঘনিয়ে আসছে।" ডাশার বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

"হ্যাঁ," তেলেগিণ বল্ল, "দুঃখের দিন আসছে আমাদের। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। বিপ্লবের পর কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে বলতে পার? একমাত্র জার বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু আমাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে উঠছে। কারখানার মজুররা নিজেদের দাবি আদায় করে নিচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের কথা কি কেউ ভেবেছে? রাশিয়ার প্রাণ, রাশিয়ার শক্তি সেই চাষার দল এখনো বিপ্লবের আস্বাদ পায়নি। অথচ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ক্ষমতা হাতে পেয়ে চিৎকার করে বলছে: একটু সবুর কর তোমরা, আমরা শাসন-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করছি। ইংল্যাণ্ডের থেকে ভালো শাসন-পদ্ধতি হবে আমাদের। এই সব বুদ্ধিজীবীর দল রাশিয়াকে এখনো চিনতে পারে নি। তাদের রাশিয়া আছে বইয়ের পাতায়। আর যাই হোক রুশরা জার্মানদের মত কল্পনাবিলাসী নয়। কল্পনার ধোঁয়ায় কতদিন আচ্ছন্ন করে রাখা চলবে কে জানে! এখনি ত তারা প্রায় ক্ষেপে উঠেছে, আর বুদ্ধিজীবীর দল চাইছে সুষ্ঠু শাসন-পদ্ধতির একতারা খসড়ার নিচে চেপে রাখতে সেই জনসমুদ্র! আসছে, আমাদের ভয়ংকর দিন ঘনিয়ে আসছে।"

তেলেগিণ থামলো। বেল বেজে উঠছে। কে যেন বাইরে কথা কইছে! কাটিয়া ছুটে গেল। রোশিন, নিশ্চয়ই রোশিন!

"ভাসিম পেট্রোভিচ, এসেছো, তুমি এসেছো!" কাটিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। "কি তোমার চেহারা হয়েছে?"

"চার দিন ঘুমুতে পারিনি। এখানে পৌঁছেই আবার সমর-পরিষদের অফিসে ছুটতে হয়েছিল। জরুরি খবর নিয়ে এসেছি।" একটু ম্লান হেসে রোশিন যেন ভেঙ্গে পড়লো একটা চেয়ারের ওপর।

তেলেগিণ, ডাশা, কাটিয়া—কারো মুখে কথা নেই।

"আমরা ডুবতে বসেছি" সে আস্তে আস্তে বল্ল, "আর দেরি নেই! সেনাদলের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিসের জন্য তারা যুদ্ধ করছে জানে না, যুদ্ধের ওপর তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। রাশিয়া, স্বদেশ—এসব কথা তাদের কাছে নিরর্থক বুলি মাত্র। তারা শান্তি চায়। অথচ, আমরা চাইছি যুদ্ধ চালাতে। তারা রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। জানি না, সমর-পরিষদ আবার কি করে তাদের অস্ত্র ধরাবে।"

রোশিন চোখ বুজলো। সবাই নীরব, অনেকক্ষণ পরে সে আবার বল্ল:

"সীমান্তে বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষরা মিলে একটা খসড়া তৈরী করেছেন, সেই খসড়া নিয়েই আমি এসেছি এখানে। তাঁদের মত হচ্ছে, এই সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়ে নতুন করে আবার গড়ে তোলা ..."

"কি, জার্মানদের হাতে স্বদেশ তুলে দেয়া!" তেলেগিণ চিৎকার করে উঠেলো।

"স্বদেশ! স্বদেশ কোথায়?" রোশিন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। "স্বদেশ—আমাদের মাতৃভূমি রাশিয়া সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যেদিন আমরা অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। পুরনো কিছু আর চলবে না, আমাদের সব আবার নতুন করে গড়তে হবে—সেনাবাহিনী, স্টেট সব কিছুতে নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

রোশিন কাঁদছে, নিঃশব্দে ওর শীর্ণমুখের ওপর অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, এবার সে টেবিলে মুখ গুঁজলো।

রাত হয়েছে। কাটিয়া আজ আর বাড়ি ফিরবে না, বিছানায় শুয়ে সে আর ডাশা ফিসফিস করে গল্প করছে। রোশিন ঘুমিয়ে পড়েছে, তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। কিছুক্ষণ পরে কাটিয়া ঘুমিয়ে পড়তেই ডাশা নিঃশব্দে উঠে এল। স্টাডিতে এখনো আলো জ্বলছে। তেলেগিণ ডিভানের ওপর বসে বই পড়ছে। ডাশা কাছে যেতেই সে বল্ল: "বোস। শোন, কি লিখেছে।"

নিচু স্বরে সে পড়তে লাগলো:

"তিনশ' বছর ধরে বন আর স্টেপের ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেল,—রাশিয়া ত নয় কবরখানা। নগরের ভস্মীভূত দেয়াল কবন্ধের মত দাড়িয়ে আছে, গ্রামের দগ্ধ খোড়ো ঘর আর ঠুটো পাইনের সার, পথে মানুষের হাড় ছড়ানো। শকুন উড়ছে, রাতে শোনা যায় ক্ষুধিত নেকড়েদের চিৎকার। ধূ ধূ করছে পথ, মাঝে মাঝে দু-একটি কসাককে দেখা যায়, ছিন্ন তাদের পোষাক ..."

তেলেগিণ একটু থামলো, আবার পড়া শুরু হল:

"রাশিয়া জনমানবহীন। ক্রিমিয়াবাসী তাতারদের পদধ্বনিও আর বেজে ওঠে না স্টেপে,—আর যে লুণ্ঠন করবার কিছুই অবশিষ্ট নেই। দশ বছর ধরে ধর্ষিত হয়েছে রাশিয়া পোল আর কসাক দস্যু দ্বারা, মন্বন্তরে সে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অনাহারে মরেছে রাশিয়া। যারা বেঁচে ছিল, তারা চলে গেছে লিথুয়ানিয়ার সীমা পেরিয়ে আরো উত্তরে, নয় ত সাইবেরিয়ায়।"

"এমনি দুর্দিনে, গোষ্ঠিপতিদের মনোনীত হয়ে একটি ছেলে জনশূন্য দগ্ধপ্রায় মস্কোয়ের রাজতক্তে বসলো। রাজ-সম্বর্ধনায় এসেছে বুভুক্ষু জনতা, ছাই উড়িয়ে হু হু করে বইছে শীতের হাওয়া। ছেলেটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো, কাঁদলো। জনতা তার চোখের জল দেখে বিশ্বাস করলো না, হয়ত রাজ-শোষণের এ আর এক পদ্ধতি। তবু বাঁচতে ত হবে। তারা দগ্ধ নগর আবার ধীরে ধীরে গড়ে তুললো; চাষারা চাষ করলো পোড়া মাটি। আবার নতুন রাশিয়ার পত্তন হল।"

তেলেগিণ বই বন্ধ করে বল্ল, "সেই রাশিয়া আজ আবার যেতে বসেছে। ডাশা, একটা গ্রামও যদি এই সর্বনাশ থেকে বাচে, আবার নতুন রাশিয়া গড়ে উঠবে, আবার আসবে শান্তি ও সমৃদ্ধি।"

"এবার ঘুমিয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে।"

ডাশা তেলেগিণের চুলে হাত বুলোতে লাগলো।

সন্ধ্যা। পথে পথে মিছিল, জনতার চিৎকার। দু একটা সরকারী গাড়ি ছুটে চলেছে, সংবাদপত্র বিক্রেতারা চিৎকার করছে। পার্কে সৈনিকদের ভিড, ঘাসের ওপর শুয়ে পথচারিণীদের সম্বন্ধে অশ্লীল কথা বলছে।

কাটিয়া নদীর ধারে একটা পাথরের বেঞ্চের ওপর এসে বসলো। আটটার সময় রোশিন আসবে এখানে। চারদিকে আলো, ব্রিজের ওপর একটি প্রহরী নিঃশব্দে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেট্রোপ্যাবলোভস্ক গীর্জার চূড়ায় সূর্যের নিভন্ত আলো, কাটিয়া কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলো। শেষ আলোর কমলারঙের আভাটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, কার স্পর্শ না? সে তাকিয়ে দেখলো, রোশিন এসে দাড়িয়েছে তারই পেছনে।

"রোশিন।"

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম—স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে যেন এক দেবী, এমনি তুমি কাটুশা।"

কাটিয়া ওর হাতের ওপর আলগা করে একটু চাপ দিল।

ওরা ব্রিজ পেরিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সমুখে এসে পড়লো। সারা বাড়িটায় আলো, ফটকে রয়েছে একটা মোটর সাইকেল।

বলসেভিকদের প্রধান অফিস। ভেতরে রাতদিন টাইপ রাইটার চলছে খট্ খট করে। এই সন্ধ্যার অন্ধকারে রেলিঙের কাছে ভিড করে আছে উত্তেজিত, অনশন-ক্লিষ্ট মুখের সার। এখুনি হয়ত কোনো নেতা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলবেন যে, পৃথিবীতে সর্বত্র বিপ্লবের আগুণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, আর পুরনো সভ্যতা পুড়ে মরছে সেই আগুনে।

"কথা, শুধু কথা," আলোকিত ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে রোশিন বল্ল, "কিন্তু কথায় কে বিশ্বাস করবে আজ? মানুষের জন্মগত সংস্কারের ওপর পড়ছে প্রচণ্ড আঘাত, এখন কে শুনতে চায় কথা? কালও আমাদের মধ্যে ছিল দেশপ্রেম, কর্তব্য আজ তার কিছুই নেই। আজ শুধু আছে কথা, কথা! সার্কাসের ঘোড়ার মত কথার কশাঘাতে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠছি।"

ওরা নীরবে চলতে লাগলো। একটা ছেঁড়া পোষাক পরা লোক হাতে বালতি, আর বগলে এক গাদা পোষ্টার নিয়ে ওদের আগে আগে চলেছে।

"যাকগে, ওসব আর ভাববো না। কাটুশা।" রোশিন এক সময় নীরবতা ভাঙলো।

"কি?"

"আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, যেতে পারব না।" রোশিনের স্বরে ভাবাবেগ।

"বন্ধু," কাটিয়া ধীরে ধীরে বল্ল, "আমিও তাই ভাবছিলাম, তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে বাঁচবো?"

লোকটা গেছে, ওদের সমুখের দেয়ালে একটা পোষ্টার এঁটে দিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। ওরা ম্লান আলোয় পড়লো: জনগণ, সাবধান, বিপ্লবের বিপদ আসন্ন।

"কাটুশা," রোশিন কাটিয়ার হাত ধরে গোধূলির ম্লান আলোয় চলতে চলতে বল্ল, "বছরের পর বছর চলে যাবে, যুদ্ধ থেমে যাবে, বিপ্লব আসবে, কিন্তু তোমাকে আমি হারাবো না, কাটুশা তোমাকে হারাবো না।"

লোকটাকে আবার দেখা যাচ্ছে। নিঃশব্দে দেয়ালের গায়ে পোষ্টার এঁটে দিচ্ছে, লাল হরফ জ্বলছে ঘোলাটে আলোয়। ওরা কাছে যেতেই লোকটা কাটিয়া আর রোশিনের দিকে তাকালো, তার চোখে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ।